প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দ্বাদশ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর

সম্পাদক
মতিউর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক ওয়াসিফ

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2022; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

রা জ নী তি

বাংলাদেশের বিভক্তির রাজনীতি
দ্বিদলীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক একচেটিয়া শাসন ৯
মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম

রা জ নৈ তি ক স ং স্কৃ তি

অশুভ যুগল : উমেদারতন্ত্র ও বিরাজনৈতিকীকরণ ২৯
সামজীর আহমেদ

স মা জ

মধ্যদ্বিত্ব সমাজ : রাজনৈতিক মধ্যবর্গ পরিচিতি ৪৩
হেলাল মহিউদ্দীন

ই তি হা স

জলাভাব জলপ্রবাহ জলময়তা ৬১
বঙ্গীয় বদ্বীপে জলীয় যাপনের বৃত্তান্ত
স্বাধীন সেন

আ ন্ত র্জা তি ক

'গর্বাচেভকে বোঝা শক্ত' ৮৯
উইলিয়াম টবম্যান

সা ক্ষা ৎ ক ার

জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রহীয় ব্যবস্থা না নিলে 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' ৯৭
দীপেশ চক্রবর্তী

সা হি ত্য

'পানিপথ'-এর দুই ঠিকানা, জাতীয় ভাবের দুই কল্পনা ১১৩
ইমরান কামাল

ব ই আ লো চ না

কয়েক দশকে 'গ্রামবাংলা'র পরিবর্তনের আদল ও ধারা ১২৫
দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সব উত্তর মিলল না ১৩৫
কাজী জাওয়াদ

দ লি ল প ত্র

নিক্সন বললেন, 'মুজিবকে গুলি কোরো না' ১৪১

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কী নামে ডাকা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকের মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে বহুদলীয় নির্বাচনী গণতন্ত্র অন্তত এখনকার বাংলাদেশে বজায় নেই। সুতরাং কর্তৃত্ববাদ, একচেটিয়াতন্ত্র ইত্যাদি নামে একে ডাকা চলছে। কেউ কেউ পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতিও বলে থাকেন। পিরামিডের মতো এই রাজনীতি ওপর থেকে নিচের দিকে পৃষ্ঠপোষকতার সিঁড়ি তৈরি করে। এখানে ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী নেতারা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আনুগত্য কিনে থাকেন। ফলে সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার জন থেকে জনে সমানভাবে বাঁটোয়ারা হয় না, অনুগতরাই হন সেসবের ভাগীদার। দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতাও এভাবেই ঘটে। এই পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি বা উমেদারতন্ত্র প্রতিযোগিতা সহ্য করে না। ফলে যে দল যখন ক্ষমতাসীন হয়, সেই দলের শীর্ষ নেতাই হয়ে ওঠেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম তাঁর *দ্বিদলীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক একচেটিয়া শাসন* প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন, এ ধরনের শাসনে রাষ্ট্র হয়ে যায় শাসকের ব্যক্তিগত হাতিয়ার।

সমাজ প্রশ্নটা বাংলাদেশে কম আলোচিত বিষয়। রাষ্ট্র আছে, রাজনীতি আছে; কিন্তু কী হলো সমাজের? রাষ্ট্র বদলানোর কথা ওঠে, সমাজ পরিবর্তন তো প্রগতিশীল রাজনীতির মুখস্থ ভাষা। অথচ সমাজে তো বদল চলছেই। বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে মানুষ নিজেও বদলে যাচ্ছে। সেই বদলের অভিমুখ কোন দিকে? সমাজও কোনো একশিলা জিনিস নয়। তারও হরেক ঘর ও ঘরানা আছে, স্তর ও স্তম্ভ আছে। সমাজের আলোচনা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা মধ্যমশ্রেণি ঘিরেই হয়। বর্তমানে সেই মধ্যম স্তরের অবস্থা কী? অধ্যাপক হেলাল মহিউদ্দীন একুশ শতকের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে সমাজ নামক ধারণাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে খতিয়ে দেখছেন। তিনি মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত সামাজিক বর্গকে 'মধ্যদ্বিত্ব' ধারণা দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। একদিকে লালিত

নীতির পিছুটান, অন্যদিকে বিত্তবাসনার টানাপোড়েন মধ্যবিত্তের মনকে দোলায়। এই দোদুল্যমানতাই কি তাদের সুবিধামুখী করে রাখে? মধ্যবিত্তরা আজকাল উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবেও নিজেদের শ্রেণি ডিঙাতে চাইছেন। ফলে দোদুল্যমানতার রাজনীতিও যেমন আছে, অর্থনৈতিক কারণও আছে। 'মধ্যদ্বিত্ব : রাজনৈতিক মধ্যবর্গ পরিচিতি' প্রবন্ধটি মধ্যবিত্ত বিষয়ে বিস্তর লেখালেখির মধ্যে নতুন সংযোজন।

এসবের সঙ্গেই জড়িত সামজীর আহমেদের 'অশুভ যুগল : উমেদারতন্ত্র ও বিরাজনৈতিকীকরণ' প্রবন্ধটি। উমেদারতন্ত্রে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ কমে আসে। জনগণ ও সরকারের মধ্যে জেঁকে বসে একদল সুবিধাভোগী উমেদার। অন্যদিকে দুর্নীতির প্রসার, জবাবদিহির অভাব এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষ রাজনীতি থেকে মুখ ফেরায়। এ অবস্থায় উন্নয়নকে দেখানো হয় রাজনীতির বাইরের বিষয় হিসেবে। এ রকম বিরাজনৈতিক পরিস্থিতি জনতুষ্টিবাদের জমিনকে উর্বর করে। ক্ষমতাসীন এলিটদের বিরুদ্ধে মাঠে হাজির হয় জনতুষ্টিবাদী বয়ান। এসবের সম্মিলিত ফল কোন ধরনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে, সামজীর আহমেদের বিশ্লেষণে মিলবে তারই আভাস।

আধুনিক কালে জল ও জমিকে আলাদা করে দেখাই রীতি হয়ে গেছে। অথচ মেঘ-বৃষ্টি-নদী-কুয়াশা-বন্যা সবই জলীয় দশার বিভিন্ন চেহারা মাত্র। প্রাক্-আধুনিক কৃষি মানুষের জীবনে জমি ও জলের এই ফারাক ছিল না। স্বাধীন সেন বলছেন, ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে তৈরি করা এই বিভাজন প্রাকৃতিকও নয়, মানবিকও নয়। পুরোনো ঐতিহ্যে নদীভাঙন, খরা কিংবা বন্যা 'দুর্যোগ' বা 'অস্বাভাবিক' কিছু নয়। জলীয় যাপনে প্রকৃতির এমন সক্রিয়তাই স্বাভাবিক। মানুষ ও প্রকৃতির মেলামেশার ইতিহাসে সৃষ্টি-ধ্বংস-স্থিতিশীলতা এবং জল-স্থল-অন্তরিক্ষের জড়াজড়ি সম্পর্ক নিতান্তই দৈনন্দিন, স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক। স্বাধীন সেনের প্রবন্ধ এসব বিষয়ে সজাগ করেছে।

কোনো দেশে জাতীয় চৈতন্য বাস্তব জমিনে পা রাখার আগে সেই সমাজের বিদ্বৎজনের কল্পনায় ধরা দেয়। সেই কল্পনা আকার পেতে থাকে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা মুহূর্তকে কেন্দ্র করে। কল্পনা প্রতীকায়িত হয় এবং ক্রমে তা জাতীয় চৈতন্যের অংশ হয়ে যায়। এমনকি জাতীয় ভাব বাস্তব চেহারা নেওয়ার পরও কল্পনার এই অভিযাত্রা থেমে থাকে না। ইতিহাসে দেখা যায়, জাতীয় ভাব ও কল্পনার নিশান থাকে আগুয়ান শ্রেণির হাতে। আর সেই শ্রেণির মধ্যে যে জাতীয় ভাব ও কল্পনা দানা বাঁধে, তার সংকট ও সম্ভাবনার আয়না হয়ে ওঠে সেই শ্রেণির সাহিত্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* ও কায়কোবাদের *মহাশ্মশান*-এর পর্যালোচনায় ইমরান কামাল ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই ধরনের কল্পনার ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছেন। ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে দুটি সাহিত্যকর্মের তুলনার চমৎকার প্রয়াস '"পানিপথ"-এর দুই ঠিকানা, জাতীয়

ভাবের দুই কল্পনা' প্রবন্ধটি।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ নেতা মিখাইল গর্বাচেভের মৃত্যু এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ৩৩ বছর পার হলেও বলা যায় না যে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে মুক্ত করেছিলেন নাকি আরও কষ্টকর যাত্রার সূচনা করে দিয়েছিলেন। গর্বাচেভ কেবল একটি মহা ট্র্যাজেডিরই জন্ম দেননি, তিনিও হয়ে উঠেছিলেন এক ট্র্যাজিক চরিত্র। মিখাইল গর্বাচেভের জীবনীকার মার্কিন লেখক উইলিয়াম টবম্যানের এই লেখা গর্বাচেভের ব্যক্তিচরিত্রের কিছু দিক বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

এবার আমরা প্রকাশ করছি প্রখ্যাত ভারতীয়-মার্কিন ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' নামে খ্যাত ইতিহাসচর্চার ধারা থেকে তিনি এখন প্ল্যানেটারি ইতিহাস বা গ্রহীয়-ইতিহাস চিন্তা নিয়ে কাজ করছেন। এর প্রেক্ষিত জলবায়ু পরিবর্তন ও অতিমারি। মানুষ একসময় সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বদলাত, এখন তারা পৃথিবী নামক গ্রহের জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতাই বদলে দিচ্ছে। দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন, মানুষ হিস্টরিকাল এজেন্ট থেকে বিজ্ঞানের বদৌলতে প্ল্যানেটারি এজেন্টে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাতে করে এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন। এ অবস্থাকে বুঝে দেখা এবং প্রতিকারের কিছু উপায় দীপেশ দিয়েছেন সারোয়ার তুষারের নেওয়া এই সাক্ষাৎকারে।

বরাবরের মতো এই সংখ্যায় একটি দেশীয় ও একটি বিদেশি বইয়ের ওপর আলোচনা রাখা হলো। গত তিন দশকে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে চলেছে গ্রামের সমাজ ও অর্থনীতিতে। ভূমি ও কৃষিতে দাপুটে পুঁজি, দখলদারি ও প্রতিরোধও চলমান। 'ভিলেজ স্টাডি' নামে খ্যাত বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে গবেষণার দীর্ঘ ঐতিহ্যে স্বপন আদনানের গ্রামবাংলার রূপান্তর বইটি একটি দৃষ্টিকাড়া অবদান। এই বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন দেবাশীষ কুমার কুন্ডু। *ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত একজন ভারতীয়র গবেষণা। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার কিছু জানা এবং কিছু না-জানা বিষয়ের ওপর নজর ফেলেছেন লেখক চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত। বইটি পর্যালোচনা করেছেন কাজী জাওয়াদ।

নিয়মিত বিভাগ দলিলপত্রে এবার ছাপা হলো একাত্তর সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের ভেতরের দ্বিধাদ্বন্দ্বের চিত্র। নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি পাকিস্তানের ভাঙনের বিপক্ষে হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাঁচাতে সচেষ্ট। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তখন ভারতকে কী চোখে দেখতো, তারও চিত্র মিলবে দলিলটিতে। *প্রতিচিন্তা* নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে যে পারছে, তার জন্য লেখক-পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাজনীতি

বাংলাদেশের বিভক্তির রাজনীতি
দ্বিদলীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক একচেটিয়া শাসন

মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায় কার্ল মার্ক্স ও ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তাধারার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রতাত্ত্বিক আলোচনায় ইদানীং বরং ওয়েবারীয় কিছু ধারণা বারবার আসছে। এর মধ্যে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র, প্রতিযোগিতামূলক স্বৈরতন্ত্র এবং উমেদারতন্ত্রের আলাপই বেশি। মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের এই প্রবন্ধে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আমলে নিয়ে নতুন করে রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা এবং রাজনীতির মূল প্রশ্নগুলো বিচার করে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোকে কী নামে ডাকা যায়, এই শাসনব্যবস্থার চরিত্র কী—তা-ই এই লেখার আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ কি নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক (neopatrimonialism) রাষ্ট্র? প্রশ্নটির মীমাংসার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজের চরিত্র নির্ণয় করা যাবে বলে লেখক মনে করেন। **মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম**-এর প্রবন্ধটি বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে গুরুত্ববহ।

ভূমিকা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোকে কী নামে ডাকা যায়, এই শাসনব্যবস্থার চরিত্র কী—তা-ই এই লেখার আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ কি নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক (neopatrimonialism) রাষ্ট্র? এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার জন্য আগে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করা দরকার। দরকার এই রাষ্ট্রের ভিত্তিতে প্রোথিত সম্পর্কের ওপর নজর ফেলা। এ লেখায় ক্ষমতার ব্যক্তিকরণ এবং উমেদারতন্ত্রের (clientalism) অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতির ব্যাখ্যায় নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের ধারণা কতটা লাগসই, তা-ও পরীক্ষা করা হয়েছে। এখানে আমরা নতুন চিন্তার নিরিখে বাংলাদেশের

রাজনৈতিক সমাজের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নতুন ধরনের একচেটিয়াতন্ত্র বলে দাবি করেছি। সুতরাং এ আলোচনায় বাংলাদেশকে কেবল নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের আলোকে পর্যালোচনা করা হবে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের বিশেষ ধরন বলে দাবি করতে গেলে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। প্রথমত, নামে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ; দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার পালাবদল নিয়মিতভাবে ঘটুক বা না ঘটুক, এখানে দৃশ্যত একধরনের নির্বাচন হয়ে থাকে। কখনো কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনও হয়। অন্যদিকে এই গণতন্ত্র শুধু গোলযোগ আর বিভ্রাটে ভরাই নয়, নেতৃত্বের আচরণও নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের সাথে মানানসই। এখানে আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়, রাজনৈতিক বিচ্যুতি এখানে সাধারণ ঘটনা। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার মেয়াদ যা-ই হোক না কেন, শাসকেরা রাষ্ট্রশক্তিকে সফলতার সঙ্গে কুক্ষিগত করে নিতে পারেন। রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী মতাদর্শ কিংবা আইনের বলে নয়, ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারেন (ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৪ :৪৬০)। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সরকারকে সংগ্রাম করে যেতে হয়। এ কারণে রাজনৈতিক পালাবদল এখানে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শাসনকে বৈধতা দিতে পারার মতো স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি শাসকেরা দেখাতে পারেন না। শাসক বদল হলেও শাসনব্যবস্থার ধরন বদলায় না। বরং 'এক রাজ্য দুই রাজবংশ' ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশে তা নতুন একগুচ্ছ এলিটকে সুযোগ করে দেয়।

নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র : সংক্ষিপ্ত ধারণা

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের 'একচেটিয়াতন্ত্র' (patrimonialism) ধারণা থেকে পরে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র (neopatrimonialism) ধারণাটি গঠিত হয়েছে (দেখুন, মেদার্দ, ১৯৮২; ক্ল্যাপহাম, ১৯৮৫ :৪৮; ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৭ :৬২)। তাই 'নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র' ব্যাখ্যা করার আগে 'একচেটিয়াতন্ত্র' প্রত্যয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নিতে চাই। ম্যাক্স ওয়েবারের (১৯৭৮ : ১০৪১) মতে, 'একচেটিয়াতন্ত্র' হলো এমন ধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে কার্যত সবকিছু খোলাখুলিভাবে এক ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় সম্পদের আদান-প্রদান ঘটে রাজনৈতিক কর্মকর্তা ও তাঁদের সহযোগীদের মধ্যে; সর্বজনের বদলে ছোট একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ হয়ে ওঠে প্রধান; ব্যক্তির শাসনের কাছে আইনের শাসন গৌণ হয়ে যায় এবং রাজনৈতিক কর্তারা ব্যক্তিগত ও

সরকারি কর্মকাণ্ডের সীমানা গুলিয়ে ফেলেন (আইজেনস্টাড, ১৯৭৩; ক্যালাগি, ১৯৮৪; বাড, ২০০৪)। এ ব্যবস্থায় শাসন করার অধিকার প্রতিষ্ঠানের বদলে ব্যক্তিকে দেওয়া হয় (ওয়েবার ১৯৭৮; থিওবোল্ড, ১৯৮২)। এ ব্যবস্থায় নেতার প্রতি আনুগত্যের উৎস আইনি-যৌক্তিক বৈধতা (legal-rational legitimacy) নয়, বরং ব্যক্তিগত অনুগত্য ও ঐতিহ্যগত বৈধতাই এখানে জুতসই। অর্থাৎ এটা এমন একধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে শাসনব্যবস্থা বা পদ্ধতি নয়, ব্যক্তির ভূমিকাই আসল। অন্যদিকে উপনিবেশোত্তর দেশগুলোতে রাষ্ট্র-সংগঠন ও বৈধতা নীতিগতভাবে হলেও যার ওপর দাঁড়ায়, ওয়েবার যাকে বলেছেন আইনি-যৌক্তিক কর্তৃত্ব; তা এখানে অনুপস্থিত। অতএব উপনিবেশোত্তর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে মুরব্বি ও মক্কেলের (Patron and Client) মধ্যে আধুনিক ধরনের লেনাদেনার ওপর, ঐতিহ্যগত আনুগত্যের ওপর নয়। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় নেতা বা শাসকেরা রাষ্ট্রকে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ বলে মনে করে থাকেন এবং অনুগত ব্যক্তিদের (clients) সহায়তায় শাসন করেন। বিনিময়ে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন। তবে ওয়েবারের এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। এ কারণে আইজেনস্টাড (১৯৭৩), মেডার্ড (১৯৮২ ও ২০০২), ক্ল্যাপহাম (১৯৮২ ও ১৯৮৫) এবং আরও অনেকে এই তাত্ত্বিক কাঠামোয় বদল ঘটিয়ে একে সমকালীন করেছেন। একে বলা হয় নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের নতুন জোয়ারের মুখে নেতাদের পক্ষে পুরোনো ধরনের একচেটিয়াতন্ত্র দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার মতো যথেষ্ট বৈধতা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। (মারকাস, ২০১০ :১১৭)। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের নেতারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নতুন নতুন যেসব কৌশল খাটাতে থাকেন, সেসবকে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের ধারণা দিয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

অন্য ভাষায়, সমকালীন বিশ্বে আইনি-যৌক্তিক কাঠামোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার খোলসের মধ্যে সেকেলে রাজরাজড়াদের কায়দার একচেটিয়া শাসন কায়েম করার পদ্ধতিকে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র বলা হয়। অর্থাৎ এটা দুই ধরনের শাসনব্যবস্থার সমন্বয়—পুরোনো ধাঁচের একচেটিয়াতন্ত্র এবং আইনি-যৌক্তিক আমলাতান্ত্রিক দাপট। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের প্রধান নির্বাহী জনসেবার নামে সীমাহীন ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা (সর্বোচ্চ যা যা করতে পারেন) চর্চা করে থাকেন। এই ক্ষমতাচর্চায় সরকারের প্রধান নির্বাহী আইন ও আদর্শের

পরোয়া না করে রাষ্ট্রকে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেন। অনুগত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এ শাসনব্যবস্থা চালু থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্পর্কের ধরন ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের মতো না হয়ে হয় জমিদার-প্রজার মতো—একজন দাতা এবং অন্যজন গ্রহীতা। রাজনৈতিক সম্পর্কের বেলায় ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যই হয় মূল বিষয়, কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতা বিবেচিত হয় না। তবে সমাজজীবনের সম্পর্ক ব্যক্তিগত ও শিথিল হলেও এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারি নিয়মগুলো হয় বিধিবদ্ধ ও যৌক্তিক। অর্থাৎ শাসনপ্রক্রিয়ার দৃশ্যমান আইনি ভিত্তি থাকলেও শাসনকাজ চলে নিয়মের বাইরে। অতএব উপনিবেশোত্তর শাসনব্যবস্থা হিসেবে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র হলো বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন উপায়ে নিয়ম ও অনিয়মের এক মিশেল।

'ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণের' লক্ষণ নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য। নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ থেকে খান (২০০৫ :৭১৪) দেখান যে এই নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার মূল বিষয় হলো নেতাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও জবাবদিহি এড়ানোর সামর্থ্য। শুধু পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শাসন করা সম্ভব হয় না বিধায় শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণ করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করতে ক্ষমতার সব ধরনের বাধা নষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন সরকারের একচেটিয়া কতৃত্বের জন্য হুমকি মনে করে নাগরিক সমাজের (Civil Society) গোড়া কেটে ফেলা হয়। নাগরিক সমাজ দুর্বল হয়ে গেলে পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে আর কিছু থাকে না। সব রকম স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ ভেঙে ফেলা হয় (ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৪ :৪৬২)। মিগদাল (১৯৮৮) দেখান, প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিদের ভয় থেকে কীভাবে স্বৈরশাসকেরা রাষ্ট্রের সেসব প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে ফেলেন, যেগুলো হয়তো তাঁদের শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিতে পারত। ফলে নয়া-একচেটিয়া শাসনব্যবস্থা আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনের আবরণে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীকে মোগল সম্রাটের মতো ক্ষমতাবান করে তোলে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় আইনের শাসন পরিণত হয় এক ব্যক্তির শাসনে।

সমকালীন বাংলাদেশে উমেদারতান্ত্রিক সম্পর্ক

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ল্যাপহাম মনে করেন যে মুরব্বি-মক্কেল (patron-client) বা উমেদারতন্ত্রের মতো ঊর্ধ্বতন-অধস্তন (superior-inferior) সম্পর্কই নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের মূল বিষয়। বাংলাদেশের রাজনীতি বোঝার জন্য সমকালীন

বাংলাদেশে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক বোঝা জরুরি। যদিও ঐতিহ্যগত মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক সমকালীন বাংলাদেশে টিকে নেই, তবুও সমাজকাঠামোতে এখনো এর কার্যকারিতা রয়েছে। মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের এই প্রায়োগিক ব্যবহার সমকালীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার অন্যতম নিয়ামক। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ সূক্ষ্ম ও আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের মুরব্বি-মক্কেল নেটওয়ার্ক হয়ে উঠেছে। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোচানেক (১৯৯৩ :৪৪) দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ পদমর্যাদা ও বৈষয়িক অবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভাজিত। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল খুবই শক্তিশালী ও দৃঢ়। হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণপ্রথাভিত্তিক। পরে সেই আদলে মুসলমান সমাজেও সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে ঐতিহ্যগত সামাজিক ভেদাভেদের বিন্যাসে বদল ঘটতে থাকলেও মান-মর্যাদার ভেদাভেদ বিভিন্নভাবে সমাজে টিকে থাকে। যেমন ভূস্বামী বা পুঁজিবাদী কৃষক, ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক, দরিদ্র প্রজা, ভূমিহীন শ্রমিক ইত্যাদি নামে শ্রেণিবৈষম্যমূলক সামাজিক স্তরবিন্যাস টিকে আছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এসব শ্রেণি এমনভাবে গড়ে ওঠে যে একটি শ্রেণি অন্য শ্রেণির ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই উচ্চ-নীচভিত্তিক সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত বাস্তবতায় সমাজে মুরব্বি-মক্কেলভিত্তিক উমেদারি সম্পর্কের জাল গড়ে তোলে।

ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর কালজুড়ে গ্রামবাংলায় মূলত অর্থনৈতিক কারণে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। যেমন পুঁজির স্বল্পতা, ভূমির স্বল্পতা, প্রজাস্বত্ব চুক্তি, বর্গাপ্রথা, চাকরির সুযোগ ইত্যাদি। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ যেমন নিরাপত্তার অভাবও বিদ্যমান ছিল। মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের দাপটে সমাজে জনে জনে সমতার সম্পর্ক কিংবা বৃহত্তর যৌথ বন্ধন গড়ে উঠতে পারে না (কোচানেক, ১৯৯৩ :৪৪)। যদিও প্রতিটি পরিবারের স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, তবু সামাজিক সম্পর্কের যে ধরন সমাজে এখনো বিদ্যমান, তাতে পরিবারগুলোকে টিকে থাকার জন্য অন্য ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এ সম্পর্ক পারস্পরিক বিনিময়ভিত্তিক, যেখানে একদল থাকে ঊর্ধ্বতন মুরব্বির অবস্থানে আর আর অন্য দল থাকে তাদের অনুগত বা মক্কেলের ভূমিকায়। এ ধরনের বিনিময় ব্যবস্থায় প্রথম গোষ্ঠী অর্থাৎ মুরব্বিরা নেন শ্রম, সেবা, সম্মান ও সমর্থন। বিনিময়ে মক্কেলগোষ্ঠী বৈষয়িক ও অন্যান্য ধরনের নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগের আশা করে। গ্রামীণ সমাজে রাষ্ট্রের ন্যূনতম সেবা যেমন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করার জন্যও দ্বিতীয় বর্গকে প্রথম বর্গের

শরণাপন্ন হতে হয়। বিনিময়ে প্রথম গোষ্ঠী চায় যে দ্বিতীয় গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য সব ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে যাবে।

যদিও গ্রামীণ সমাজকাঠামোর সঙ্গে নগরের সমাজকাঠামোর সরাসরি তুলনা চলে না, তারপরও দেখা যায় যে নগরসমাজেও মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক নানা কায়দায় টিকে আছে (ইসলাম, ২০০৬ :৪)। একটি প্রচলিত প্রবাদ 'চাচা-মামা ছাড়া চাকরি হয় না' বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কোনো কিছু পেতে হলে 'কানেকশন' বা যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। চাকরি পেতে, চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কোনো ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে চাচা-মামা অর্থাৎ একজন মুরব্বির প্রতি আনুগত্য করা আবশ্যক। রেহমান সোবহান (২০১০ :৮) দেখান, 'দক্ষিণ এশিয়ায় বঞ্চিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের কাছে যেমন, তেমনি টাকাওয়ালাদের কাছেও নির্যাতিতই রয়ে যান। এ অবস্থায় মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক ধরে তাঁদের অত্যাচারী ব্যক্তিদের কাছেই আশ্রয়-প্রশ্রয় চাইতে হয় বলে বিদ্যমান ক্ষমতাবিন্যাস অটুট থেকে যায়।' বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিনের সামরিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর নব্বইয়ের দশকে এক ধরনের গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও সমাজের সব স্তরে উমেদারতন্ত্র ঠিকই বহাল থাকে। বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে সমকালীন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা কিছুসংখ্যক অভিজাতগোষ্ঠীর ক্ষমতা আরও প্রবল করেছে। রেহমান সোবহানের (২০১০ :৮-৯) মতে, 'রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ধনী এবং সামাজিকভাবে ক্ষমতাবানেরা তাঁদের ক্ষমতা একচেটিয়া করছেন। ফলে তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত পদ কাজে লাগিয়ে সম্পদ বাড়াচ্ছেন এবং নিজেদের ক্ষমতা আরও সুসংহত করছেন।'

এভাবে রাজনৈতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে উমেদারতন্ত্র ওপর থেকে নিচে বাংলাদেশি সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। পিরামিড আকৃতির এই কাঠামো প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে প্রান্তিক কৃষককে পর্যন্ত যুক্ত করেছে। প্রতিটি পর্যায়ে, যেমন জেলা বা থানায় প্রত্যেক প্রভাবশালী মুরব্বি তাঁদের ওপরের মুরব্বির আনুগত্যের মাধ্যমে যে ক্ষমতা বা সম্পদ অর্জন করেন, তা দিয়ে নিজস্ব পৃষ্ঠপোষকতার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

বাংলাদেশে ক্ষমতার ব্যক্তিগত একচেটিয়াকরণ

পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতে না পারে, তার জন্য প্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিমূলক

এবং দক্ষ সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশে গত ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সব সময় মরিয়া হয়ে থাকেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সব সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধীনে রাখতে চেয়েছে। সরকারের নির্বাহী শাখার মাধ্যমে প্রায় সব নেতাই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছেন। যারাই ক্ষমতায় থাকুক না কেন—সেনাবাহিনী বা যেকোনো রাজনৈতিক দল—ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রশ্নে সব সরকারের নেতাদের চরিত্র একই রকম থাকে। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ক্ষমতাচর্চার গুণগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। ক্ষমতা কেবল একটি ছোট গোষ্ঠীর বদলে অন্য একটি ছোট গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। এ বিষয়টি বোঝার জন্য প্রবন্ধের এই অংশে ১৯৯১ থেকে ২০১৪ কালপর্বে বাংলাদেশের চারটি নির্বাচিত সরকারের ওপর আলোকপাত করা হবে।

তাত্ত্বিকভাবে নয়া-একচেটিয়া শাসনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখতে পারে। তাদের পক্ষে আন্তএলিট সমঝোতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না (ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৪ :৪৬৫)। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক সাফল্য থাকলেও ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া যখন সরকার গঠন করেন, তখন তাঁর কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তারপরও তাঁর দল ও দপ্তরে তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য কোনো নেতার ছিল না। বরং দলীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে দল ও সরকারে অনেক বেশি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দেন। দুই মেয়াদের শাসনামলে তাঁকে সব সময় ঘিরে রাখতেন একদল অনভিজ্ঞ উপদেষ্টা, যাঁদের অনেকে আগে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের চাটুকার উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দলই প্রধানমন্ত্রীর ওপর তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইত। এ কারণে খালেদা জিয়ার মূল সংকট ছিল দল ও সরকারে তাঁর পরের নেতা নিয়োগ করা; কেননা প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্য সেই পদের দাবিদার হতেন। কোচানেক (২০০ :৫৩৪) মনে করেন, খালেদা জিয়া সরকারের প্রথম শাসনামলে সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া ছিল 'ধীর, অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, এবং প্রচণ্ড ব্যক্তিক'। খালেদা জিয়ার সঙ্গে কাজ করেছেন এ রকম একজন আমলার সাক্ষাৎকার থেকে তাঁর আমলে সরকারের কেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত

গ্রহণের কথা জানা যায় (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গুলশান, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ২০১০)। তৎকালীন সময়ে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসের প্রেরিত এক তারবার্তা থেকে জানা যাচ্ছে যে,

> খালেদা জিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভে পদবি বা প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা মুখ্য নয়। তাঁর প্রতি আনুগত্য, নৈকট্য এবং তাঁর জন্য কাজ করাই হলো আসল। দলের ভেতরে প্রভাবশালী অনেকেরই তাঁর ছেলে এবং উত্তরাধিকারী তারেক জিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুখবর হলো, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে এ রকম ১২ থেকে ১৭ জনের কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে। খারাপ খবর হলো, এই প্রভাবশালীদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশেরই খালেদা জিয়ার রাজনীতি ও শাসনের ওপর চাপ তৈরি করার সামর্থ্য বা আগ্রহ রয়েছে (উইকিলিকস, ২০১১ ক)।

অনুরূপভাবে, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম আমল (১৯৯৬-২০০১) সম্পর্কে মার্কিন গবেষক কোচানেক (২০০০ :৫৩৬) মন্তব্য করেন,

> আওয়ামী লীগের ভেতর ক্ষমতার চর্চা খুবই কেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোপনীয়তার চর্চা লক্ষণীয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় কোনো রকম পূর্বপরামর্শ থাকে না। মন্ত্রিপরিষদসহ অন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে গৌণ ভূমিকা পালন করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় শেখ হাসিনা তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের ওপর নির্ভর করে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোপনীয় নথি থেকে জানা যায়, রাষ্ট্রীয় ও দলীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'শেখ হাসিনা নির্ভর করেন খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশের ওপর; এতে থাকেন তাঁর বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক বন্ধু এবং দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষিত ও অনুগত উপদেষ্টাগণ। অবিশ্বস্ত বা অনুগত বলে চিহ্নিতরা কখনো এ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে না। বোন এবং একমাত্র ছেলে হলেন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্তজন (উইকিলিকস, ২০১১ খ)।' রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন ধারা থেকে অনেকে এ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলে থাকেন। ২০১১ সালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত *দি ইকোনমিস্ট* পত্রিকায় বলা হয়, 'তাঁর শাসন (শেখ হাসিনা) ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে।'

রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং উমেদারি

বাংলাদেশে যে উমেদারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তা কেবল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই বিদ্যমান নয়, বরং এটি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতিতেও বহাল রয়েছে। আদর্শগত দিক ও দলের জন্মের ইতিহাস ধরে অনেকেই

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনা করতে চান। কিন্তু বাস্তবে, গত তিন দশকে বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর আদর্শগত পার্থক্য অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। বরং তাদের মধ্যে কিছু গড় চরিত্র লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো উমেদারতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন খান ও অন্যান্য, ২০০৮ এবং ইসলাম, ২০০৬)

অনেকে বংশগত রাজনীতি ও দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রহীনতাকে মূল সংকট বলে মনে করেন। আদতে এগুলো উমেদারতন্ত্রের উপাদানমাত্র। এই উপাদানগুলোর মূল কাজ দলীয় প্রধান বা সরকারপ্রধানের ক্ষমতা অটুট করা। কেন্দ্রীভূত এই ক্ষমতা মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের ধারা অনুসরণ করে পিরামিড আকারে কেন্দ্র থেকে ক্রমশ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনীতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরছি—ক. প্রতিযোগিতামূলক দ্বিমেরুমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং খ. মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতি।

ক. প্রতিযোগিতামূলক দ্বিমেরু রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতন নতুন এক ধারার রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলে ছিল দ্বিমেরুমুখী ব্যবস্থার উত্থান। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে ওঠে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে। দল দুটির মধ্যে প্রতিযোগিতা এতই প্রবল ছিল যে ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তারা পালা করে পাঁচবার সরকার গঠন করে। প্রতিবার তারা পরস্পরের অস্তিত্ব বিনাশের জন্য সক্রিয় থাকে। ২০১৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক‌ভাবে সরকার গঠন করে চলেছে এবং বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি তার পুরোনো সামর্থ্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিএনপি যে এখনো সরকারের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, তা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিতই প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের এই দ্বিমেরুমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্রের জন্য আশীর্বাদ হওয়ার কথা ছিল, যেমনটি দেখা যায় ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমে। কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতা সাংঘর্ষিক এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের রাজনীতি স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক এ বিভক্তির পাশাপাশি আদর্শিক দিক থেকে সমাজ ও

জনগণের মধ্যেও পরিষ্কার বিভাজন লক্ষ করা যায়। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে শক্তিশালী দ্বিমেরুমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি পক্ষের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলাদেশের মতো সমজাতীয় (homogenous) রাষ্ট্রেও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর মতো গোত্রীয়করণ ঘটিয়েছে। এই বিভক্তির চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে 'জয়ীরা-সব-পায়' (winner-takes-all power game) রাজনীতি। এটা এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে দল ক্ষমতায় থাকলে সব পাওয়া যায়, আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। তবে মোহসিন ও গুহঠাকুরতা (২০০৭ :৫০) মনে করেন, 'এই মেরুকরণে শ্রেণিগত পার্থক্য প্রতিফলিত হয়নি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বন্দ্বের মূল বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার ভাগাভাগি, অন্য কিছু নয়। যেমন চাকরির ভাগ, সম্পত্তির অধিগ্রহণ, দরপত্র, ব্যবসায়িক লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তারই দল দুটির ছাত্র শাখা অর্থাৎ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের রাজনীতির মূল বিষয়।' এ ধরনের জয়ীরা-সব-পায়ভিত্তিক রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় নেতাদের মধ্যে কোনো ধরনের আপস-মীমাংসার সুযোগ থাকে না।' (ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৪ :৪৬৫)

ফলে ক্ষমতায় না-থাকার অর্থ অনেকটা রাজত্ব হারানোর মতো। একইভাবে বাংলাদেশে অনেকটা 'এক রাজত্ব দুই রাজবংশ' ধাঁচের শাসন কায়েম হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা বিভক্তির কিছু উপাদান হলো বাঙালি বনাম বাংলাদেশি, পাকিস্তানপন্থী বনাম পাকিস্তানবিরোধী, ভারতপন্থী বনাম ভারতবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ বনাম ইসলামপন্থী, জিয়া বনাম মুজিব ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো আবার দেশের দুটি দল আলাদাভাবে ধারণ করে। তাই চূড়ান্ত বিবেচনায় আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির রেষারেষি হয়ে দাঁড়ায় দেশের বিভক্তি।

খ. মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতি

অনেকে রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রহীনতা, বংশগত রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ইত্যাদিকে বাংলাদেশি রাজনীতির বড় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এসব বৈশিষ্ট্য হলো মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে পদবিধারী নেতারা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাঁদের দলীয় প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রচারণা চালান। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাংলাদেশের রাজনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'একচেটিয়াতন্ত্র'কে বেছে নিয়েছেন। এ ধরনের বিশ্লেষণের মূল বক্তব্য হলো, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর 'নেতা এবং কর্মীদের সম্পর্ক হলো নিঃসন্দেহে মুরব্বি-

মক্কেল সম্পর্কের অনুরূপ' (রীয়াজ, ২০০৮ :২৩)। খান (২০০০ :১৭) মনে করেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার ধারা পিরামিড আদলে ওপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বড় নেতা তাঁর পছন্দের স্থানীয় নেতাকে মদদ দেন, স্থানীয় নেতা তাঁর পছন্দের অনুসারীদের দেখে রাখেন এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁদের অনুসারী বেছে নেন। বিনিময়ে জাতীয় নেতারা স্থানীয় নেতাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন, তাঁদের টিকিয়ে রাখেন আর স্থানীয় নেতারা জাতীয় নেতাদের সমর্থনবলয় হয়ে কাজ করেন।

সমকালীন বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্রসংগঠনগুলোতে নেতা-কর্মীরা প্রায়ই বলে থাকেন, 'আমি অমুক ভাইয়ের রাজনীতি করি।' 'ভাই' টিকে থাকলে দলে ওই নেতা-কর্মী পদ-পদবি পাবেন আর 'ভাই' টিকে না থাকলে তাঁরাও পাবেন না। এই 'ভাই' অর্থাৎ 'নেতা'-নির্ভর রাজনীতি হচ্ছে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতি। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতি টিকে থাকে দেশের অন্য দুটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে—১. পারিবারিক রাজনীতি; ২. দলের ভেতরে গণতন্ত্রহীনতা।

বাংলাদেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলে উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক রাজনীতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মে ১৯৮১ সাল থেকে দলটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। অর্থাৎ তিনি প্রায় ৪১ বছর এই দায়িত্বে আছেন। এ সময়ে দলের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন মোট ছয়জন নেতা। অন্যদিকে ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসনের দায়িত্বে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এই পদে তিনি ৩৮ বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে অসুস্থতা ও দণ্ডিত হওয়ার কারণে খালেদা জিয়ার অবর্তমানে তাঁর ছেলে তারেক জিয়া এখন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। জাতীয় পার্টিতেও প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁর স্ত্রী এবং ছোট ভাই জি এম কাদের চেয়ারপারসন মনোনীত হন। পরিবারের বাইরের কেউ এ ধরনের নেতৃত্বকে কখনোই চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেন না। কারণ, মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতিতে নেতাকে চ্যালেঞ্জ করার ঝুঁকি অনেক বেশি। বড় নেতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না পেরে অনেক নেতাই রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হারিয়েছেন। তা ছাড়া স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সব সময়ই শীর্ষ নেতৃত্বকে তোষণের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে তাঁরা শীর্ষ নেতৃত্বের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেন। তোষণের মাধ্যমে পদ-পদবি অর্জন

করা ও ধরে রাখার মধ্য দিয়ে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্কের রাজনীতি আরও শক্তিশালী হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণের উপায় ও কৌশল

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এখন পর্যন্ত প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করছে (যদিও বিএনপি ২০০৬ সালের পর থেকে ক্ষমতার বাইরে রয়ে গেছে)। এ দুটি রাজনৈতিক দলের শাসনের কায়দা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, বলা প্রয়োজন ১৯৯১ সাল থেকে রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কাঠামোই রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনা করলেও আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী, পুলিশ-র‍্যাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। তারপরও এসব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদ-পদবি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ রাজনীতিবিদেরাই ঠিক করেন একজন সামরিক বা বেসামরিক আমলার ভবিষ্যৎ (দেখুন, আলাভী, ১৯৭২ :৬২)। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ কাল-পর্বের শাসনব্যবস্থার চরিত্র ভিন্ন। আগের শাসনব্যবস্থাকে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কতিপয়তন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আর বর্তমান শাসনব্যবস্থা হচ্ছে রাজনৈতিক-সামরিক-আমলাতান্ত্রিক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এক জোট বা মিশ্রণ। এর কেন্দ্রে রয়েছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক একে আখ্যায়িত করেছেন সিভিকো-মিলিটারি-করপোরেটতন্ত্র হিসেবে (দেখুন, ফারুক ওয়াসিফ, ২০০৯)। এই সংস্কৃতির অংশ হিসেবে রাজনৈতিক-সামরিক-আমলাতন্ত্রের যেকোনো সদস্য শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করতে পারলে সীমাহীন ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারেন।

ক. আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত শাসন : 'প্রধানমন্ত্রীর জন্য সরকার'

সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে এমন দেশগুলিতে প্রধানমন্ত্রীকে সাধারণত মন্ত্রিপরিষদের 'সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম' (first among equals) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর পর আশা করা হয়েছিল যে সরকারপ্রধানের অবাধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে ১৯৯১ সালে যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়, তাতে প্রধানমন্ত্রী অন্যদের সমকক্ষ নন

বরং পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতির মতো ক্ষমতাশালী থাকেন। ফলে সংসদীয় সরকার গঠিত হলেও তা সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ আগের রাষ্ট্রপতির দপ্তর কেবল নতুন সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রূপান্তরিত হয়েছে (দেখুন, মুহিত, ২০০৬)

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গবেষক আকবর আলি খান (২০০৯) এই পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এটা 'প্রধানমন্ত্রীর সরকার, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য সরকার'। সাংবিধানিকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা, কার্যবিধি এবং বিভিন্ন উদাহরণ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বা ইঙ্গিত ছাড়া বাংলাদেশে কখনো কিছু হয় না। ২০০৪ সালে পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ কমিটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বজায় রাখার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কমিটির মতে, এ রকম পৃথক দপ্তর কেবল রাষ্ট্রপতিশাসিত দেশে থাকতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে এ রকম দপ্তর বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে কমিটি (জাহান, ২০০৪)। এ প্রস্তাবের প্রায় দুই দশক পরও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর একই রকমভাবে কার্যকর রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও লাগাতারভাবে বেড়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

খ. অকার্যকর সংসদ

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্র চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা কখনোই কার্যকর থাকেনি। যে কারণে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান (দেখুন, সোবহান, ২০০৪; রিয়াজ, ২০১৩)। ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সংসদ অকার্যকর করার জন্য সাধারণত প্রধান বিরোধী দলকে দায়ী করা হতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জাতীয় সংসদে পরপর দুবার আওয়ামী লীগ এবং দুবার বিএনপি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে। এবং এ ক্ষেত্রে সব সময়ই বিরোধীদলীয় নেতা, যিনি পূর্ববর্তী সরকারের প্রধান ছিলেন, সংসদ অকার্যকর করে রাখার জন্য সরকারকে দায়ী করতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ওই একই নেতা সংসদ কার্যকর করার জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেননি। এ কারণে বলা যায় যে সংসদের অচলাবস্থার জন্য মূলত সরকার দায়ী। আমরা জানি, নয়া-একচেটিয়াতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। সুতরাং বলা যায়

যে সরকারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন সরকার সংসদ অকার্যকর করতে চেয়েছে।

২০১৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের সংসদে কার্যকর কোনো বিরোধী দল নেই। এ পর্যায়ে সংসদ অকার্যকর রাখতে বিরোধী দলকে দায়ী করার কোনো সুযোগও তাই নেই। তারপরও সরকার পরিচালনার বেলায় জাতীয় সংসদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বাদ রেখে প্রধানমন্ত্রীকে তোষণ করায় ব্যস্ত থাকেন। সংসদ সদস্যরা নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঠিক রাখতেই এই তোষণমূলক কর্মকাণ্ড করেন বলে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজ মনে করেন (২০১০ :২৪১)।

গ. বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শাসন করতে চেয়েছে। তবে ১৯৯১ সালে দ্বিদলীয় সাংঘর্ষিক রাজনীতির আবির্ভাবের পর বিচার ও পুলিশ বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। ঐতিহ্যগতভাবেই পুলিশ ও বিচার বিভাগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিরাজমান। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটেনে গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আমলাতন্ত্রনির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এখনো ঔপনিবেশিক শাসনপ্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারগুলোর মধ্যে নিজেদের অনুগত বিচারক নিয়োগের প্রবণতা বেড়ে যায়। নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারগুলো বিচারব্যবস্থার ওপর প্রধানত দুটি কারণে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়। প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু থাকলে এই বিচারকগণ ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতি হবেন এবং পরে অনুগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হবেন। এর পেছনে রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য ছিল অনুগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দিয়ে নির্বাচনব্যবস্থায় প্রভাব ফেলা। দ্বিতীয়ত, বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সরকারি দল বিরোধী দলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। অর্থাৎ বিচারব্যবস্থা দিয়ে বিরোধী দল দমন করার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্টে মোট ১৭ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ

দেওয়া হয়। এই নিয়োগপ্রক্রিয়াকে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন। এমনকি প্রধান বিচারপতি প্রথমে ১৭ জনের মধ্যে দুজনের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, যদিও সংবিধান অনুসারে তিনি শপথপাঠ গ্রহণে বাধ্য। তাঁদের একজন একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি দিয়েছিলেন। সুপারিশকৃত বিচারপতিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে *প্রথম আলো* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে (দেখুন ১ মে, ২০১০) দেখানো হয়, ওই বিচারপতিদের কেউই বিচারপতি হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। ১৭ জনের মধ্যে ৯ জন আইন অধ্যয়ন করলেও তৃতীয় বিভাগে পাস করেছেন। তবে বলা বাহুল্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, বরং রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে তাঁদের অনেকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

ঘ. আমলাতন্ত্র ও পুলিশি কায়দায় ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ

বাহ্যত বাংলাদেশে এমন এক ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যা ম্যাক্স ওয়েবারের ভাষায় লিগ্যাল-র‍্যাশনাল বা আইনি-যৌক্তিক কর্তৃত্ব। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসক নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশে প্রশাসক নিয়োগ ও পদোন্নতির বেলায় আনুগত্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতাই মূল বিবেচ্য। ২০১২ সালে বিবিসি বাংলা রেডিওর এক সাক্ষাৎকারে সাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন যে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন এখন সম্পূর্ণভাবে দলীয়। তিনি বলেন, জনপ্রশাসনে দলীয়করণের সূচনা ১৯৯০-এর দশকে এবং সেই প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে যেমন সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, এমনকি চিকিৎসকের পদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ সবই দলীয়করণ করা হয়েছে। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গবেষক আকবর আলি খান মনে করেন, বাংলাদেশে জনপ্রশাসনের রাজনীতিকরণ করা হয়েছে নিয়োগের ক্ষেত্রে, পদায়নের ক্ষেত্রে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এমনকি চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ জনপ্রশাসনের প্রায় সব স্তরে রাজনীতিকরণ ছড়িয়ে পড়েছে (দেখুন, খান ও খান, ২০১২)।

অন্যদিকে নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকার পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে থাকে।

মহসিন ও গুহঠাকুরতা (২০০৭ :৫০) মনে করেন যে 'রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে কঠোর আইন প্রয়োগ করে এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। এ জন্য র‍্যাবের (Rapid Action Battalion) মতো আরও বলপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে ভিন্নমতের এবং জনগণের জন্য কথা বলার সুযোগ কমে যায়।'

পুলিশ বিভাগে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও মূল বিষয় সরকারের প্রতি আনুগত্য। স্বাধীনতার ৫১ বছরেও পুলিশ ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য কোনো স্থায়ী নীতিমালা তৈরি হয়নি। ফলে মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় নেতিবাচক ভাবমূর্তি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'ম্যানেজ' করতে না পারা ও সিনিয়রদের 'গুডবুকে' না থাকার কারণে যোগ্য কর্মকর্তারা পদোন্নতিবঞ্চিত হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গোয়েন্দা প্রতিবেদন (*জনকণ্ঠ*, ১৭ মে ২০২২)।

পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য সরকারের প্রতি তার পূর্ণ আনুগত্যের ফলে পদোন্নতিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে এর বিনিময়ে সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য নানা উপায়ে পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে। যেমন বিরোধী দল দমন, নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় সরকারি প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ ইত্যাদি। সম্প্রতি মার্কিন অর্থ দপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের বেসরকারি সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে যে র‍্যাব এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ২০০৯ সাল থেকে প্রায় ৬০০টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ৬০০-এর বেশি লোকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং নির্যাতনের জন্য দায়ী।' এতে আরও বলা হয়, 'কিছু রিপোর্টে আভাস পাওয়া যায় যে এসব ঘটনায় বিরোধীদলীয় সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের টার্গেট করা হয়েছে।' এর ফলে 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কাজে জড়িত থাকার' অভিযোগে র‍্যাব এবং এর ছয়জন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দেখুন, https ://www.bbc.com/bengali/news-59609988)।

ঙ. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র

নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের দ্বৈতনীতি থাকে। শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সরকারের পক্ষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সম্ভব হয় না। এ কারণে সরকার তার অনুগত ব্যক্তিদের অর্থাৎ মক্কেলদের বাঁচাতে নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন সন্ত্রাসী বা দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের রক্ষা করা। বাংলাদেশে বিভিন্ন আমলে সরকারি

নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা প্রত্যাহার করার উদাহরণ রয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য ছিল মূলত নেতা-কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া। এতে সরকারের সমর্থক বাড়ে এবং অপরাধী জনগোষ্ঠী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী থাকে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১৩ মেয়াদের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক' বিবেচনায় ৭ হাজার ১৯৮টি মামলা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছিল হত্যা মামলা। ইতিমধ্যে এসব মামলার বেশির ভাগ সুপারিশ মেনে আদালত থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওই সময় আলোচিত কিছু মামলাও রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার হওয়া নিয়ে তীব্র সমালোচনা হলে এ-সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি বিলুপ্ত করা হয় (*প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ-সংক্রান্ত একটি আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছিলেন। এসব মামলার তালিকায় হত্যা ছাড়াও ধর্ষণ, নাশকতা, ঘুষ লেনদেন, সরকারি টাকা আত্মসাৎ, ডাকাতি, অবৈধভাবে অস্ত্র নিজ দখলে রাখা, কালোবাজারি, অপহরণ, জালিয়াতি, বোমা, চুরি ও অস্ত্র মামলা রয়েছে।

অন্যদিকে ২০০১-০৬ মেয়াদে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারও একই কায়দায় ৫ হাজার ৮৮৮টি মামলা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ৯৪৫টি মামলা থেকে কিছু আসামিকে অব্যাহতি দেয়। ওই সময় মোট ৭৩ হাজার ৫৪১ জন আসামি এই প্রক্রিয়ায় বিচার এড়াতে সক্ষম হন (*প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। ২০১৭ সালে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক বিবেচনায় ৩৪টি হত্যা মামলাসহ নতুন করে ২০৬টি আলোচিত মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে দেড় শতাধিক মামলা আওয়ামী লীগের পরপর দুই মেয়াদের সরকারের আমলে করা। অধিকাংশ মামলার বাদী ছিল সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। মাত্র এক বছর আগে করা মামলাও প্রত্যাহারের তালিকায় ছিল। আইনজীবী শাহদীন মালিক মনে করেন, সরকারি নেতা-কর্মীদের মামলা প্রত্যাহারে বিচারব্যবস্থা দলীয়করণের অস্বাভাবিক আরেকটি ধাপ (*প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

মামলা থেকে অব্যাহতি ছাড়াও সরকার তার অনুসারীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে বিভিন্ন রকম আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন সংসদ সদস্যদের দেওয়া হয় করমুক্ত গাড়ি আমদানি করার সুবিধা (বিস্তারিত দেখুন *দ্য ডেইলি স্টার*, ২০০৯)। এ সুযোগের ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারালেও সমর্থক ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে

পারে। এর ফলে এমনকি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরাও সরকারের প্রতি কিছুটা নমনীয় থাকেন। ঢাকার গুলশান, বনানী, উত্তরার মতো অত্যন্ত মূল্যবান জায়গায় শেখ হাসিনার সরকারের দেওয়া ৩০১টি আবাসিক প্লট পর্যালোচনা করে কোচানেক (২০০০) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি তুলে ধরেন।

অন্যদিকে নিজ দলের অনুগত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বিরোধী দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করতে সরকার পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, আদালত এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে সরকারি দলের অনুসারীদের জন্য যে ধরনের দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করা হয়, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের জন্য একই রকম মামলা অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়। বিরোধী নেতারা প্রায়ই সরকার ও আদালত কর্তৃক ভয়াবহ রকম হিংসাত্মক আচরণের অভিযোগ করে থাকেন (বেনিয়ান [দ্য ইকোনমিস্ট], ২০১১ ক)।

চ. হয় জিতো নাহয় মরো : প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ক্ষমতায় থাকার কৌশল

নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ ধরনের শাসনব্যবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হয় অত্যন্ত সহিংস (ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে, ১৯৯৪ :৪৬০)। ১৯৯১ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়েছিল, ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন এইচ এম এরশাদ। স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতা দখলকারীদের পরিণতিও হয়েছিল ভয়াবহ। ১৯৯১ সালের পরে একাধিকবার প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটলেও সেই প্রক্রিয়া কখনো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি। ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৭-০৮ এবং ২০১৩-১৪ সালে দেশজুড়ে যে ভয়াবহ প্রাক্-নির্বাচনকালীন সংঘাত হয়েছে, তা প্রমাণ করে, বাংলাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর কোনো সহজ প্রক্রিয়া না। ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ হচ্ছে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। তাই যেকোনো মূল্যে তাঁরা ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

খালেদা জিয়া দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল কোনোবারই শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়নি। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালে মাগুরায় অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। এ

আন্দোলন দুই বছর চলমান ছিল। এ সময়ে বাংলাদেশে মোট ১৭৫ দিন রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে ৯২ দিন দেশজুড়ে হরতাল পালন করা হয় এবং ২২ দিনব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলমান ছিল (কোচানেক, ২০০০ :৫৩৫)। বিরোধী দলের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন, অসহযোগিতা কর্মসূচি এবং সরকারি কর্মচারীদের 'জনতার মঞ্চ' নামক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কারণে শেষ পর্যন্ত বিএনপিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে, ২০০৬ সালে রাজনৈতিক বিবেচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নিয়োগের চেষ্টার প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো আবার বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। যার অবসান ঘটে দুই বছর মেয়াদি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা মোট তিন মেয়াদে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ হাসিনার সরকার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। ২০১১ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মামলায় একটি সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত আদেশ দেন। এর মাধ্যমে আপিল বিভাগের বিচারকদের ৪ :৩-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত নির্বাচনব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যাতে করে কোনোভাবেই ক্ষমতাচ্যুত হতে না হয় (বেনিয়ান [দ্য ইকোনমিস্ট], ২০১১ বি)।

উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান, তা হলো নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র। তাত্ত্বিকভাবে যদিও নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র একটি একক ধারণা বা কনসেপ্ট, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্পষ্টত বৈচিত্র্য রয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ কালপর্বে আফ্রিকায় বিদ্যমান বিভিন্ন নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করে ব্রাটন ও ফন দ্য ওয়ালে (১৯৯৪ :৪৬৪) দেখান যে আফ্রিকায় শাসনব্যবস্থার মধ্যে চার ধরনের নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র বিদ্যমান। এগুলো হলো ব্যক্তিগত একনায়কত্ব, সামরিক গোষ্ঠীশাসন, গণভোটকেন্দ্রিক শাসন এবং একদলীয় ব্যবস্থা। ২০১৩ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই লেখক দেখিয়েছিলেন

যে এই চার ধরনের বাইরে বাংলাদেশে নতুন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান, যাকে আমি প্রতিযোগিতামূলক দ্বিমেরুমুখী নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছিলাম। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে, পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, এখানে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। সরকার গঠন করার পর দুটো দলই শক্তিশালী বিরোধী দলের মতামত উপেক্ষা করে নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং আছে।

২০১৫ সালের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা খালেদা জিয়া প্রশ্নবিদ্ধ বিচারপ্রক্রিয়ায় দণ্ডিত হওয়ার পর এবং তাঁর ছেলে তারেক জিয়ার দেশত্যাগের পর বিএনপি কিছুদিন আগপর্যন্ত সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছে।

ওপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার জনগণের সমর্থনের বদলে পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য কায়দায় নিজেদের ক্ষমতা সংহত করে থাকে। এই শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি একব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে নয়া-একচেটিয়াতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। তবে একদলীয় শাসন বিদ্যমান থাকায় এই শাসনব্যবস্থাকে একদলীয় নয়া-একচেটিয়াতন্ত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

● **মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে। আন্তর্জাতিক জার্নালে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশের পাশাপাশি ২০২২ সালে নিউইয়র্কের *রাউটলেজ* থেকে প্রকাশ করেছেন *হোয়াই ন্যাশনস ফেইল টু ফিড দ্য পুওর : দ্য পলিটিকস অব ফুড সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ*।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

অশুভ যুগল : উমেদারতন্ত্র ও বিরাজনৈতিকীকরণ

সামজীর আহমেদ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তকে নির্বাচনী গণতন্ত্র, প্রতিযোগিতামূলক একচেটিয়াতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদ—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এর একটা সাধারণ চরিত্র হলো প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে বাংলায় উমেদারতন্ত্রও বলা যায়। উমেদারতন্ত্রে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ কমে আসে। অন্যদিকে দুর্নীতি, ক্ষমতাশালীদের জবাবদিহির অভাব এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক পরিবেশ মানুষকে ক্রমশ রাজনীতিবিমুখ করে তোলে। এ অবস্থায় উন্নয়নকে দেখানো হয় রাজনীতির ঊর্ধ্বের বিষয় হিসেবে। পাশাপাশি যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচক্র রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলদের চেয়ে বিশেষজ্ঞ ও আমলা-প্রশাসনের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তখন রাজনীতি অবান্তর হয়ে পড়তে থাকে। এ রকম বিরাজনৈতিক পরিস্থিতি জনতুষ্টিবাদের জন্য জমিনকে উর্বর করে তোলে। যেহেতু রাজনীতি, উন্নয়ন সবকিছুকে তারা এলিটদের কাজ বলে দেখায়, তখন এই এলিট-অপরদের বিরুদ্ধে মাঠে হাজির হয় জনতুষ্টিবাদী বয়ান। এসবের সম্মিলিত ফল কোন ধরনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে, **সামজীর আহমেদ**-এর বিশ্লেষণ তারই গতিসূত্র দেখিয়ে দেয়।

ভূমিকা

বাংলাদেশি গণতন্ত্রের রুগ্‌ণ অথবা মতান্তরে মরণাপন্ন দশা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। গণতন্ত্রের এই মুমূর্ষু দশার সঙ্গে সম্পর্কিত দিকগুলোও আলোচিত হওয়া দরকার। যেমন রাজনীতিতে সক্রিয় দলগুলোর ব্যর্থতা, গণতন্ত্রের ধারণাগত ও প্রক্রিয়াগত সমস্যা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংকট ইত্যাদি। যত কঠিনই হোক না কেন, খাঁটি রাজনৈতিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশা থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা যখন রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে তৈরি

হয়, তখন রাতারাতি তা সমাধান করা দুরাশা হয়ে ওঠে। এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে মোটাদাগে দৈনন্দিন পর্যায়ে প্রচলিত রাজনীতির ধারণা ও তার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক আচরণকে বোঝাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং বিরাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা নির্ণয়ই বর্তমান লেখার মূল লক্ষ্য। এই প্রবন্ধ মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশে আলোচিত হবে বাংলাদেশের প্রধান ধারার রাজনীতির সাংস্কৃতিক ধরন; দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হবে বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তার প্রভাব এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ অংশে আলোচিত হবে বাংলাদেশীয় রাজনীতির গতিমুখ।

উমেদারতান্ত্রিক রাজনীতি

বাংলাদেশের জন্মকালীন প্রতিজ্ঞা ছিল যে এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ হবে। সময়ের সঙ্গে গণতন্ত্রের এই যাত্রা কেবল হতাশারই জন্ম দিয়ে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এত আকাঙ্ক্ষা ও আলোচনার গণতন্ত্র কেন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলেছে? এর সঙ্গে যুক্ত আরও গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বাংলাদেশে এক শাসনামল থেকে অপরাপর শাসনামলকে খুব কমই আলাদা করা যায়, কমই পার্থক্য করা চলে? মোবাশ্বার হাসান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কীভাবে প্রায় সব শাসনামলে একই উস্মাহ রাজনীতি চলমান থাকে।

এঙ্গেলসেন রুড বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট* রাজনীতিকে। বাংলায় একে বলা যায় উমেদারি সম্পর্ক। উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক যোগসাজশের ব্যাখ্যায় এই ধারণাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধারণাটি প্রাথমিকভাবে নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত হলেও রাজনৈতিক জোটবদ্ধতা, সুবিধাবাদিতা এবং জনগণের হিস্যা কতিপয়ের

---

*সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত Patron-client Relationship কথাটি এখন রাজনৈতিক অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এরই পারিভাষিক ব্যবহার Clientelism। কেউ কেউ একে পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি বলে থাকেন। সামন্তীয় ব্যবস্থায় প্যাট্রন মানে মুরব্বি বা পৃষ্ঠপোষক, যিনি জমি দান করেন, কিংবা সুবিধা বণ্টন করেন। আর ক্লায়েন্ট হলেন মক্কেল বা খাতক। তবে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নেতা, প্রভাবশালী পদাধিকারী, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের কাছে আনুগত্যের মাধ্যমে কাজ-পদ-ঠিকাদারি-চুক্তি-ঋণ ইত্যাদি পাওয়ার যে বন্দোবস্ত, তা সাবেকি উমেদারির সঙ্গে তুলনীয়। উমেদার উমেদারির মাধ্যমে কাজ হাসিল করে নেয়, সেই অর্থে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট রাজনীতিকে উমেদারি রাজনীতি এবং ক্লায়েন্টেলিজমকে উমেদারতন্ত্র বলে ব্যবহার করা চলে।—**সম্পাদক**

মধ্যে বণ্টনের ব্যাখ্যা অনেকে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট বা উমেদারি সম্পর্ক দিয়ে করে থাকেন। রাষ্ট্রের প্রদত্ত সুবিধা কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আনুগত্যের মাধ্যমে সুবিধাভোগী কোনো গোষ্ঠী বা লোকজনের মধ্যে বিতরিত হওয়া উমেদারতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। জেমস স্কট (James Scott) উমেদারতান্ত্রিক সম্পর্কের রূপ বা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলেন, এই সম্পর্ক সাধারণত অসম ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মধ্যে লেনদেনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সুবিধা বা ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আশায় কম ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ভোট কিংবা আনুগত্যের মাধ্যমে উচ্চক্ষমতাধর ব্যক্তি বা প্যাট্রনের হয়ে কাজ করে। এখানে প্যাট্রনের ভূমিকা পালন করে সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যদিকে ক্লায়েন্ট বা উমেদারের ভূমিকায় থাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তি। এই সম্পর্কের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সুবিধা বিনিময়ের নীতি। এখানে প্রভাবশালী ব্যক্তি সমর্থন আদায়ের জন্য নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে নেতা বা প্যাট্রনের ব্যক্তিগত চরিত্রবল কিংবা তার প্রতি শ্রদ্ধা নয়, বরং কাজ করে স্বার্থভিত্তিক আনুগত্য। স্বার্থ পূরণ না হলে বা তার সম্ভাবনা কমে গেলে কিংবা প্যাট্রন ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাই আনুগত্যও দ্রুতই বদলে যায়। বাস্তব লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশই এখানে মূল বিষয়।

এই উমেদারতান্ত্রিক রাজনীতিই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় পরিচায়ক। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক কিংবা যে ধরনের শাসনই চলমান থাকুক—এই উমেদারতান্ত্রিক রাজনীতিই বাংলাদেশের সব শাসনামলকে প্রায় একই চেহারায় আটকে দেয়। এ বিষয়টি নিয়েই এরিল্ড এঙ্গেলসেন রুড বলছেন,

The rhetoric is about the formal institutions, while reality includes the subversion of formal organisational institutions, rules and expectations by a conduct that seeks delivery of resources in favour of allies or clients, or of oneself. The existence of this reality after decades of formal institution building is indicative of a social and political 'prison', a pattern of behavior socially or culturally so deeply embedded that successive regimes in Bangladesh cannot be distinguished from one another with respect to this underlying behavior (Ruud 2020 : 174).

রুডের মতে, মাফিয়া, সিন্ডিকেট ও গোষ্ঠী—এই তিনটি ধরনে বাংলাদেশে

উমেদারতান্ত্রিক সম্পর্ক চলমান। এই ধরনগুলোর পার্থক্য মূলত মাত্রাগত। উমেদারতান্ত্রিক সম্পর্ক দিয়ে তৈরি নেটওয়ার্কে থাকেন ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সাংবাদিক, পরামর্শক, আমলা ও রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদি। মাফিয়া, সিন্ডিকেট ও গোষ্ঠী এই তিন ধরনের বর্গের প্রধান ঝোঁক হলো প্রতিষ্ঠান বা আইন ও বিধিবিধানকে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুবিধামতো ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন। ফলে এখানে বিস্ময়করভাবে আইনের ফাঁক বেশি। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ জানেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রায় সব দুর্নীতিই মাকড়সার জালের মতো গড়ে ওঠা এই উমেদারি পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশে সিন্ডিকেটের কারসাজি হিসেবেই পরিচিত। আইন কোথায় প্রয়োগ হবে আর কোথায় হবে না, তা ঠিক করে এই উমেদারতন্ত্র। কখনো কখনো আইন তৈরিও হয় প্রতারক চেহারা ধারণ করে। ওপর থেকে তাকে কার্যকর দেখালেও ভেতরে তা অকার্যকারতার নামান্তরমাত্র। একটি কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করি। ধরা যাক, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে, যা আইন করে ঠেকানোর চিন্তা করা হলো। মূলত নিয়োগপত্র ইচ্ছেমতো পাল্টে দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার মারফত নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমেই দুর্নীতিটা সেখানে হয়। এখানে সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হলো মৌখিক পরীক্ষা। সমাধান হিসেবে আইন করা হলো লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার। কিন্তু যে সিন্ডিকেট মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিল, সেই একই সিন্ডিকেট এবার লিখিত পরীক্ষার দায়িত্বে। ফলে অপছন্দের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার স্তরে আরও সহজেই বাদ দেওয়া গেল। কারণ, মৌখিক পরীক্ষার যেমন গাণিতিক মানদণ্ড নেই, তেমনই নেই লিখিত পরীক্ষারও। সমস্যা তাই মিটল না। এবার আরও একটি আইন করা হলো যে প্রার্থীকে খুবই উচ্চ ফলধারী হতে হবে। এই উচ্চ ফল আবার নির্ধারিত হবে সেই সিস্টেমের শিক্ষকদের দ্বারাই, যাদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত এই প্যাট্রন-ক্লায়েন্টনির্ভর রাজনীতি শাসকদল বা শাসনের ধরনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ক্রীড়নক বদল করে তার মূল কাঠামোকে অক্ষত রেখে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। বৃহত্তর রাজনীতিতে এর প্রভাব নিয়েও রুড একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন,

'These "large factional agglomerations of patron-client favours and loyalties" carry the weight of the country's poor governance record and the inability of state development funds to reach where they

should' (Ruud 2020 : 174).

উমেদারতান্ত্রিক সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আন্তযোগাযোগ। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন সরকার এবং জনগণের মধ্যে মোচনের অতীত দূরত্ব তৈরি হয়, তখন জন্ম হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারীর; যাকে সাধারণ ব্যবহারে 'দালাল' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ফলে 'দালাল' বা ব্রোকার হচ্ছে সরকারব্যবস্থা পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। চক্রকেন্দ্রিক রাজনীতিতে দালালের ভূমিকা বোঝা তাই দরকারি। দালালের অনেকগুলো ধরন আছে। সরকারি দপ্তরের বাইরে সাধারণত যেসব দালালকে আমরা চিনে থাকি, তাদের থেকে চক্রীয় দালালেরা ভিন্ন চরিত্রের হয়। সিন্ডিকেটের প্রায় সব সদস্যের ভূমিকাই দালালের মতো। চক্রের চূড়া থাকে না, থাকে কেন্দ্র— তাই কেন্দ্রে অবস্থানকারীও একধরনের মধ্যস্থতাকারী। এই চক্রীয় ব্যবস্থা উপরিতলের বা মূলধারার রাজনীতিতেও বিশেষ ধরনের এক রাজনৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ যাকে চিহ্নিত করছেন 'নয়া নেতা' নামে। নয়া নেতার সংজ্ঞায়নে তিনি বলছেন,

'Naya Netas (or New Leaders), These newly emerged village leaders are usually between 25 and 40 years of age…[and] educated to about middle school [level]. They read newspapers…and are experienced [in dealing] with the government bureaucracy, with banks, insurance companies, and the like.…These new leaders can be of any caste, but they must have knowledge, perseverance and ability' (Krishna 2011 : 105-6).

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে 'নয়া নেতা'র সংজ্ঞায়নে আমি কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করতে চাই। বাংলাদেশে শহরকেন্দ্রিক একধরনের সরকারি সুবিধাকেন্দ্রিক নেতা ক্রমশ তৈরি হচ্ছে বলে দেখা যায়। এই গোষ্ঠী অবশ্যই মাঝারি থেকে উচ্চশিক্ষিত। সরাসরি তারা কোনো দলের সদস্য নয়। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচিতির সুবাদে তারা মূলত বিভিন্ন সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরি করে সুবিধার হেরফের করে থাকেন। তাদের যোগাযোগের মূল লক্ষ্য সাধারণত প্রভাববলয় নির্মাণ, অর্থের কারবার সেখানে থাকতেও পারে, না-ও পারে। রাজনীতির বদলে যাওয়া ধরনের ফল হলো এই নতুন নেতৃত্ব। বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি যখন ক্রমশ রাজনীতিবিদ ও জনগণ উভয়ের নাগালের বাইরে চলে যেতে

থাকে, তখনই এই বিশেষ নতুন নেতৃত্ব দেখা দেয়।

বিরাজনৈতিকীকরণের রাজনীতি

দুনিয়াজুড়ে রাজনীতি অধ্যয়নে বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয় হলো বিরাজনৈতিকীকরণ। বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সরাসরি খারিজ বা গ্রহণ করা—দুটিই বেশ কঠিন। বিরাজনৈতিকীকরণ কী, সে বিষয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য সংজ্ঞায়নের স্বার্থে আমি দ্বারস্থ হতে চাই উড ও ফ্লিন্ডার্সের কাছে। বিরাজনৈতিকীকরণ মানচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা বলছেন,

A map, that is, which is sensitive to how 'depoliticisation', in the broader literature in political science and beyond, commonly refers to a rebalancing or a shift in the nature of governance relationships that involves not only the displacement of decisions from politicians, but the exercise of power by many non-state actors as well (Wood and Flinders 2014 : 154).

সরকারব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে রাজনীতিবিদদের অগ্রাধিকার খর্ব হওয়া বিরাজনৈতিকীকরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজনীতিবিদেরা এভাবে সরকারব্যবস্থায় থেকেও সরকারব্যবস্থার ওপর প্রভাব হারাতে পারেন। রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতার ওপর বিরাজনৈতিকীকরণের পক্ষের ব্যক্তিদের সন্দেহ আরোপ করার মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়। একজন রাজনীতিবিদ যখন সরকারব্যবস্থা বিষয়ে কোনো তত্ত্বীয়, প্রায়োগিক ও বিশেষ জ্ঞান না রেখেই শুধু জনগণের সমর্থনের কারণে সরকারব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক হয়ে যান, তখন তা সরকারব্যবস্থাকেই দুর্বল করে তোলে বলে অভিমত বিরাজনৈতিকীকরণের প্রবক্তাদের। বিরাজনৈতিকীকরণের যুক্তি কীভাবে দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হিসেবে এখানে কলিন হের বই থেকে ইউএস ফেডেরাল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নর্সের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালান এস ব্লাইন্ডারের একটি উক্তি তুলে ধরছি,

Those who say that big government is the problem have got it wrong. The real problem is that government is pushed and pulled by interest groups and partisan politicking, often at the public's expense… (Technocrates) Shift responsibility for things like tax from the politicians

to the experts; besides knowing more, they work in a politics-free zone. Tossing the ball to the technocrats won't weaken democracy… but it will produce better policy (Hey 2007 : Ebook).

ব্লাইন্ডারের অবস্থান এখানে স্পষ্ট। তিনি সরকারব্যবস্থাকে মোটাদাগে টেকনোক্র্যাটদের দিকে নেওয়ার পক্ষে। তিনি মনে করেন, এতে গণতন্ত্র আরেকভাবে লাভবানই হবে। এ কথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে সরকার পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অবশ্যই জরুরি, কিন্তু সেটা যদি রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নাকচ করে, তাহলে ব্লাইন্ডার যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তার অস্তিত্বই আর থাকে না। সে ক্ষেত্রে বিরাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ জনগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে ওঠে; জনগণের কাছে যাঁদের কোনো দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি নেই। এই ক্ষমতার একমাত্র বৈধতা হলো ওই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, যা গণতন্ত্রের আদর্শিক অস্তিত্বকে ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে। উড ও ফ্লিন্ডার্স তিন ধরনের বিরাজনৈতিকীকরণের কথা বলেছেন : রাজনৈতিক, সামাজিক ও ডিসকার্সিভ বা বৌদ্ধিক।

রাজনৈতিক বিরাজনৈতিকীকরণ : রাজনৈতিক বিরাজনৈতিকীকরণ হলো সরকারব্যবস্থাসহ মোটাদাগে রাজনীতি-ব্যবস্থা থেকেই রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব কমানোর ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এই বিরাজনৈতিকীকরণ চোখে পড়ে। বেশ কিছু কারণেই বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থাও একটানাভাবে ব্যুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকে চলেছে। রাজনৈতিক বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়া যে বাংলাদেশে বিরল নয়, তার প্রমাণ মিলবে জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সাংসদ ফিরোজ রশীদের একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছেন, 'রাজনীতির মঞ্চগুলো আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীরা দখল করছেন। দেশ চালাচ্ছে কারা? দেশ চালাচ্ছেন জগৎশেঠরা। দেশ চালাচ্ছেন আমলারা। আমরা রাজনীতিবিদেরা এখন তৃতীয় লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য। অথচ এই দেশ স্বাধীন করেছেন রাজনীতিবিদেরা। (*প্রথম আলো* ২৮ জুন, ২০২১)। একই দিনে সরকার দলের প্রবীণ রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'যাঁরা রাজনীতিবিদ, যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থান যে আছে, সেখানে তাঁদের থাকা উচিত।' (*প্রথম আলো* ২৮ জুন, ২০২১)। বাংলাদেশে বিরাজনৈতিকীকরণের পক্ষে ব্লাইন্ডারের মতো সরাসরি ও স্পষ্টভাবে পক্ষপাতিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার প্রবক্তার উদাহরণ খুব একটা না থাকলেও রাজনৈতিক বিরাজনৈতিকীকরণ কিন্তু ঘটেই চলেছে।

সামাজিক বিরাজনৈতিকীকরণ : উড ও ফ্লিন্ডার্সের আলোচনায় সামাজিক বিরাজনৈতিকীকরণকে এমন এক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ফলে সমাজে রাজনীতিবিষয়ক বিতর্ক ক্রমশ কমে যেতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী বিতর্ক আর জনপরিসরে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় না। ফলে রাজনীতি বিষয়ে জনগণ ক্রমাগত আগ্রহ হারাতে থাকে। বাংলাদেশে এই বিরাজনৈতিকীকরণ কতখানি চলমান, তা বিস্তারিত গবেষণার বিষয়। তবে কলিন হে রাজনীতিতে আগ্রহ হারানো যে আধুনিক বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর কথা বলছেন, বাংলাদেশকে তার বাইরে বিবেচনা করা কঠিন। দৈত্যাকার বিনোদন মাধ্যম, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, আনুষ্ঠানিক রাজনীতি থেকে আস্থা হারিয়ে যাওয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্বায়ন এই ধরনের বিরাজনৈতিকীকরণে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে।

বৌদ্ধিক বা ডিসকার্সিভ বিরাজনৈতিকীকরণ : বৌদ্ধিক বা ডিসকার্সিভ বিরাজনৈতিকীকরণ বলতে একধরনের পছন্দহীনতার রাজনীতিকে বোঝায়। যখন কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে পছন্দ-অপছন্দ বা বিতর্কের ঊর্ধ্বে হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন সে বিষয়টি চলে যায় বিরাজনৈতিকৃত এলাকায়। আধুনিককালে উন্নয়নের ধারণাকে এমন বিতর্কের ঊর্ধ্বের বিষয় হিসেবে গণ্য করানোর জন্য চাপ জারি থাকতে দেখা যায়। অথচ রাজনৈতিক বিষয় মানেই বিতর্কযোগ্য বিষয়। এ ব্যাপারে শান্টাল মৌফ বলেন,

'...political questions are not mere technical issues to be solved by experts. Proper political questions always involve decisions that require making a choice between conflicting alternatives' (Scott 2022 : 330).

বিরাজনৈতিকীকরণের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে এটি খুবই শক্তিশালী একটি প্রক্রিয়া এবং এটা রাজনীতির গতিপথ তীব্রভাবে পাল্টে দিতে পারে। রাজনৈতিক বিরাজনৈতিকীকরণের কিছু প্রায়োগিক সুবিধা থাকলেও ভারসাম্যহীন বিরাজনৈতিকীকরণ সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিরাজনৈতিকীকরণের সঙ্গে মিলে জনগণকেই রাজনীতির ময়দান থেকে বের করে দিতে পারে।

উমেদারতন্ত্র, বিরাজনৈতিকীকরণ এবং লোকতুষ্টি রাজনীতি

বিরাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনো রাজনীতিহীন পরিস্থিতি নয় বরং এটি হচ্ছে রাজনীতির একটি বিশেষ ধরন, যা রাজনীতিবিদ এবং প্রকারান্তরে জনগণকেই

রাজনীতির বাইরে ঠেলে দেয়। জনগণ এই প্রক্রিয়া বুঝুক কিংবা না বুঝুক, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তারা প্রক্রিয়াটির ফল অনুভব করতে সক্ষম। বিরাজনৈতিকীকরণ যখন উমেদারতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে মিলে যায়, তখন আরেক ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা জনগণকে দ্বিগুণ কোণঠাসা করে ফেলে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে এমন দূরত্ব তৈরি হয়, যার সুযোগ নেয় দালালদের চক্র। সরকারব্যবস্থায় জনগণের কোনো অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ না থাকায়; এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনও কোনো গুণগত ফল নিয়ে আসে না। সেটি কেবল পাঁচ বছরের জন্য এমন প্রতিনিধি নির্বাচনের আয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, যে প্রতিনিধি আদতে জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রতিনিধিত্বের এই অবসান মানে গণতন্ত্রের মূল চেতনারই অবসান।

জনগণের এ ধরনের কোণঠাসা পরিস্থিতিই পপুলিস্ট বা লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির জমিন উর্বর করে। পপুলিজমের 'পিপল' তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ তারা কেবল ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর ইচ্ছার বাহন কিংবা সমর্থক কিংবা নীরব দর্শক হতে পারে; জনগণের তরফে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ তাদের থাকে না। জনগণ আসলে একটি বিমূর্ত ধারণা, যা মূর্ত হয় বিশেষ কোনো মুহূর্তে কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া সমষ্টিগতভাবে জানানোর মধ্য দিয়ে। বিরাজনৈতিকীকৃত পরিবেশে যখন জনগণ রাজনীতির মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ হারিয়ে ফেলে, যখন নির্বাচনী গণতন্ত্রেও তাদের যৌথ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, তখন তারা সংগঠিত হবে কিসের ভিত্তিতে, কোন কর্মসূচির মাধ্যমে? তখন তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে কেবল কোনো 'অপর' শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ। জনগণ যেহেতু একটি মুহূর্তকেন্দ্রিক ধারণা এবং সেই বিশেষ মুহূর্তে জাগরণের জন্য প্রয়োজন হয় ওই 'অপরের'। বিরাজনৈতিকীকরণ এবং সিন্ডিকেট বা গোষ্ঠীভিত্তিক মহলের রাজনীতি এই 'অপর'-এর ছবি তাদের সামনে হাজির করে। এই অপর নির্মাণের রাজনীতি একধরনের এলিট চর্চা। ধারণাগতভাবে এলিটিজম দাঁড়িয়ে থাকে পৃথক্করণ এবং উচ্চ-নীচ ধারণার ওপর। বিরাজনৈতিকীকরণ এবং চক্রীয় রাজনীতি কেবল বিশেষ শ্রেণিকে সাধারণ বা অ-বিশেষ থেকে আলাদাই করে না, ওই বিশেষ শ্রেণির সুবিধাদি এমন উপায়ে নিশ্চিত করা হয় যে তা প্রায়ই জনগণের অসুবিধার সমান হয়ে ওঠে। কারণ, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের নামে যখন রাজনীতিকে রাজনীতিবিদমুক্ত দেখতে চাওয়া হয়, তখন তা প্রকারান্তরে জনগণকে তার

প্রতিনিধিসহ রাজনীতির বাইরে ঠেলে দেয়। ফলে বিরাজনৈতিকীকরণের পার্শ্বফল হিসেবেই জনগণের 'অপর' বা বিপরীত হিসেবে এলিট শ্রেণিকে নির্মাণ করা হয়। অতএব, বিরাজনৈতিকীকরণ জন্ম দেয় এমন একধরনের রাজনীতিবিরোধী চেতনার, যার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় পপুলিজম বা লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতি। এ ব্যাপারে এলিয়েন গ্ল্যাসার বলেন, 'Populism is the primary symptom of anti-politics, post-politics and also politics revival.' (Glaser 2020 : Ebook)। লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির সৃষ্টিই হয় বিরোধমূলক সম্পর্ককে ঘিরে। ফ্রানসিসকো পানিজ্জা দেখিয়েছেন, কীভাবে বুশ প্রশাসন টুইন টাওয়ার হামলাকে কেন্দ্র করে 'আমরা এবং তারা'কেন্দ্রিক লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল। লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির সঞ্জীবনী শক্তি হলো অপরের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা। বিরাজনৈতিকীকরণ প্রথমে রাজনীতির প্রতি জনমানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তারপর সেই রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যেই চলে লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতি ও তাদের নেতাদের আবির্ভাবের আয়োজন। এ প্রসঙ্গে ক্যানোভান বলছেন, 'Capitalizing on popular distrust of politicians evasiveness and bureaucratic jargon, they (populist) pride themselves on simplicity and directness.' (Canovan 1999 : 5)। এই প্রবন্ধে আলোচিত বিরাজনৈতিকীরণের প্রথম ধরনের সঙ্গে ক্যানোভানের উক্তিটি মিলিয়ে পড়লে এটা স্পষ্ট হয় যে কীভাবে বিরাজনৈতিকীকরণ প্রকারান্তরে লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির জন্ম দিতে পারে।

রাজনীতিবিরোধিতার উপাদান কীভাবে লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতিকে মূলধন সরবরাহ করে, তা পানিজ্জা তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সে অঞ্চলের লোক-রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা বারবার নিজেদের অরাজনৈতিক দাবি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে পানিজ্জার লেখা থেকে ১৯৬০-এর দশকে দেওয়া উরুগুয়ের রাষ্ট্রপতি জর্জ পাচেকো এরিকোর বক্তব্যের একটি অংশ তুলে ধরছি :

I am not a politician, at least not in the common sense of the term. I am a man who fights with all his force against everything which is not in the national interest.

Mine is the conduct of the affairs of the state, mine are the decisions which I have been taking—frequently and alone—to defend you from violence, inflation and the country's international discredit and economic delinquency...I intend with renewed vigour to bring forward the solutions

required by the new circumstances (Panizza et al. 2005 : 21).

এরিকোর এই বক্তব্য হচ্ছে রাজনীতিবিরোধিতাকেন্দ্রিক লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির প্রিয় সুর। লৌহনায়কেরা নিজেদের মনে করেন রাজনীতির কূটকৌশল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা মানুষ; যিনি নাকি সরাসরি জনগণের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রতিনিধি।

লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির এই আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, এটাও আসলে রাজনীতির আরেকটা ধরন, যা জনগণকে পুনরায় ক্ষমতাশালী করার কথা বলে বিরাজনৈতিক ক্ষেত্রকে পুনরায় রাজনৈতিক করে তোলে। ফলে লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতিকে পুনরায় সত্যিকারের গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। কিন্তু ঠিক এই জায়গায় লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির বিদ্যায়তনিক পাঠ হুঁশিয়ারি জানায়। লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের উদাহরণ আগেই দিয়েছি। হিটলার, ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদি এবং পুতিনও লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির ফসল। তাঁরা কতখানি গণতন্ত্রায়ণ করেছেন এবং জনগণের হাতে কতটা ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন কিংবা কতটা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা প্রশ্নবিদ্ধ। লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির বিপদের জায়গা হলো, এটি সাধারণ জ্ঞাননির্ভর রাজনৈতিক আন্দোলন, যা সবার সাধারণ অভিজ্ঞতাজনিত (সাধারণ ক্ষোভ) কোনো বিষয়ের বিরোধিতায় গড়ে ওঠে। ভারতে যেমন মুসলমানবিরোধী সাধারণ অভিজ্ঞতার ঐক্যবদ্ধ রূপ হিসেবে গড়ে উঠেছে বিজেপির লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতি। বাংলাদেশেও কখনো ধর্মপন্থী কখনো বা যুদ্ধাপরাধবিরোধী ঐক্য গঠিত হতে দেখা গেছে। এই রাজনীতি কারও পক্ষের ধ্বনির চেয়ে 'অপর' পক্ষের বিরুদ্ধেই ঘৃণা জানায় এবং অপরের বিরুদ্ধেই জনমত গঠন করে শক্তিশালী হয়। যদিও এই ঐকমত্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদি এবং এই ঐকমত্য যদি অতিশক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে তা নিজেই স্বৈরাচারী রূপ ধারণ করে, যার পরিণতি হলো ওই ঐকমত্যেরই ভাঙন। বিষয়টি স্কট ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

… the term 'common sense' in populism draws on its own incoherence to mean a multitude of things to a multitude of groups simultaneously, and is never articulated clearly, because 'common sense' is drawn from the experience of a heterogeneous 'common people' who are identifiable only by virtue of what they are not : the powerful.

…the centrality of incoherence makes the depoliticising nature of

common sense difficult; indeed, it does reflect a certain experience of 'the people' (as explained earlier) but must intentionally avoid doing so in any authoritative way, for to do so would be an attempt at coherence and ultimately risk the loose aggregation formed around 'common sense' (Scott 2022 : 333-34).

স্কটের উক্তিটি বাংলাদেশে একটি উদাহরণ থেকে আরও স্পষ্ট করা যায়। বাংলাদেশে অতিসাম্প্রতিক অতীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারার জন্ম না হলেও এ ধরনের রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ আছে। গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে বাংলাদেশে লোকরাজনীতির সম্ভাবনা এবং এর সম্ভাব্য বিপজ্জনক দিক একসঙ্গেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম উদাহরণ হিসেবে আমি ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনকে নিতে চাই। লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতি যেভাবে খুবই সাধারণ ঐকমত্যের ওপর দাঁড়ায়, সেভাবে যুদ্ধাপরাধের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে তৈরি হয়েছিল একটি অংশের ঐকমত্য। কিন্তু আন্দোলনটি যখনই অনেকগুলো কারণে বিশেষ হতে শুরু করে, তখনই আন্দোলন হিসেবে তার মুখ থুবড়ে পড়ার সূচনা। দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে এখানে হেফাজতে ইসলামের উত্থানকে নেওয়া যায়। তবে শাহবাগের সঙ্গে হেফাজতের পার্থক্য ছিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। হেফাজতের দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক রাজনৈতিক চরিত্র আছে, যা শাহবাগের নেই। হেফাজতের রাজনৈতিক উত্থানও একধরনের লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির ফল। হেফাজতের দাবি অনুযায়ী তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তাই তাদের দাবি, তারা কোনো রাজনীতি করছে না। তবে তারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অ-ইসলামি চরিত্রের বিরোধী এবং বাংলাদেশের ইসলামিকীকরণ তাদের অভীষ্ট। রুড ও হাসানের গবেষণায় দেখা গেছে, কীভাবে একই সঙ্গে রাজনীতিবিরোধী এবং ইসলামায়নের পক্ষে জনমত গড়ে উঠছে। রুড ও হাসান থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

Interviewees stated that the Awami League and the political class in general was corrupt and was the main cause of inequality in the country. They were deeply dissatisfied with the political and economic situation, and they perceived the country as having a negative political culture. In the words of one Hefazat activist, contemporary Bangladesh had become characterised by 'moral decay and corruption everywhere'. He felt that the country needed 'ethical good Muslim leaders to lead

us and help establish an equal, just society where rights will thrive' (Ruud & Hasan 2021 :82).

উক্তিটিতে দেখা যাচ্ছে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী কেবল ক্ষমতাসীন দলই নয়, অন্য সব রাজনৈতিক দল অর্থাৎ অ-ইসলামিক দল বা আরও স্পষ্টভাবে দেশের রাজনীতিকেই যাবতীয় দুর্দশার কারণ বলে মনে করছেন এবং সমাধানের জন্য তাকিয়ে আছেন নৈতিকতাসম্পন্ন ইসলামি নেতাদের দিকে। ঠিক এটাই হচ্ছে লোকরাজনীতির রূপ, যা রাজনীতি করবে রাজনীতিবিরোধিতার নামে।

অন্য পক্ষে ইসলামি লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতি কেন বাংলাদেশে এখনো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেনি বা তার সম্ভাবনা কেন আদতে কম, তার কার্যকারণ পাওয়া যাবে স্কটের উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে। সাধারণ ঐকমত্যকে যখনই বিশেষ ঐকমত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে, তখনই তা সাধারণ ঐকমত্যের শক্তি ও ব্যাপকতা হারাবে। কোনো ঐকমত্যকে 'ইসলামি' হিসেবে চিহ্নায়নের সঙ্গে সঙ্গে তা সাধারণ ঐকমত্যের গুণাবলি হারায়। তখন ওই বিশেষ ঐকমত্য থেকে যাঁরা ইসলামিকীকরণের পক্ষে নন, তাঁরা ছিটকে পড়েন। পাশাপাশি হেফাজতের মতো দল যাঁরা আদর্শিক স্বৈরবাদকে শুরুতেই স্পষ্ট করে তোলেন (যেমন হেফাজতের নারী স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থান), তাঁদের লোকরাজনীতির সাফল্যের পথ তখন কঠিন হয়ে ওঠে।

উপসংহার

বর্তমান আলোচনা থেকে এমন একটি সিদ্ধান্ত টানা যায় যে বাংলাদেশে উমেদারতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিরাজনৈতিকীকরণের রাজনীতি শুধু সক্রিয়ই নয়, তারা একে অপরের সহযোগী। রাজনীতির এই দুই ধরনের মিলনের যৌক্তিক ফল হিসেবে জনমানুষের ভেতর সামগ্রিকভাবে রাজনীতির প্রতি ক্ষোভ জন্মানোর কথা। এই ক্ষোভের পেছনে বিশ্বায়ন, যুদ্ধ, হাইপার কানেক্টিভিটির মতো কিছু বৈশ্বিক ও প্রযুক্তিগত কারণও রয়েছে। তাই বাংলাদেশের রাজনীতির পুনঃ রাজনৈতিকায়ন জোর সম্ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা বিরাজনৈতিকীকরণ এমন ধরনের সমস্যা তৈরি করে, যার সমাধান কেবল পুনঃ রাজনৈতিকায়নের পথেই ঘটা সম্ভব। তবে সেটা নির্ভর করে বাংলাদেশে চলমান বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়ার স্থিতিস্থাপকতার ওপর। অন্যদিকে এখানে লোকতুষ্টিবাদী রাজনীতির ধরন কেমন হবে, তা সাধারণ হয়েও দূরদর্শী হবে নাকি অদূরদর্শিতার বিস্ফোরক বুদ্‌বুদ হিসেবে পুনরায়

রাজনৈতিকায়ন প্রক্রিয়াকে আরও দূরে ঠেলে দেবে; তা আগামীর রাজনীতি এবং রাজনৈতিক চিন্তক ও রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল।

● **সামজীর আহমেদ** ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তথ্যসূত্র :

Canovan, M. (1999). Trust the people! populism and the two faces of democracy. Political Studies, 47(1), 2-16. https ://doi.org/10.1111/1467-9248.00184

Glaser, E. (2020). Anti-politics : On the demonization of ideology, authority and the State. ReadHowYouWant.

Hay, C. (2007). Why we hate politics. Polity press.

Krishna, A. (2011). Gaining access to public services and the Democratic State in India : Institutions in the Middle. Studies in Comparative International Development, 46(1), 98-117. https ://doi.org/10.1007/s12116-010-9080-x

Panizza, F. (2005). Populism and the Mirror of Democracy. Verso.

Ruud, A. E. (2020). The mohol : The hidden power structure of bangladesh local politics. Contributions to Indian Sociology, 54(2), 173-192. https ://doi.org/10.1177/0069966720914055

Ruud, A. E., &; Hasan, M. (2021). Radical right islamists in Bangladesh : A counter-intuitive argument. South Asia : Journal of South Asian Studies, 44(1), 71-88. https ://doi.org/10.1080/00856401.2021. 1847410

Scott, J. A. (2021). 'there is no alternative'? the role of depoliticisation in the emergence of populism. Politics, 42(3), 325-339. https ://doi.org/10.1177/0263395721990279

Verkerk, J., Teisman, G., &; Van Buuren, A. (2015). Synchronising climate adaptation processes in a multilevel governance setting : Exploring synchronisation of governance levels in the Dutch Delta. Policy &; Politics, 43(4), 579-596. https ://doi.org/10.1332/030557312x655909

সরকারের 'আমলানির্ভরতায়' ক্ষোভ, সতর্ক হতে বলছেন রাজনীতিকেরা. (2021, June 28). Prothom Alo. https ://www.prothomalo.com/politics/সরকারের-আমলানির্ভরতায়-ক্ষোভ-সতর্ক-হতে-বলছেন-রাজনীতিকেরা

খাতি চিন্তা
সমাজ

মধ্যদ্বিত্ব সমাজ : রাজনৈতিক মধ্যবর্গ পরিচিতি

হেলাল মহিউদ্দীন

কৈফিয়ত

'মধ্যদ্বিত্ব' ধারণাটির সঙ্গে 'দ্বৈততা' শব্দটির যতটা যোগাযোগ, 'বিত্তের' সংযোগ ততটাই কম। সাধারণভাবে (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া) মধ্যবিত্ত বর্গটির দ্বৈততার মূলে রয়েছে বৈপরীত্য, দোদুল্যমানতা ও ভীতিপ্রবণতা। রাষ্ট্র ও সমাজের যেকোনো অন্যায়-অনাচারে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। পরিবর্তনের জন্য মাঠেও নামে দ্রুততার সঙ্গে। আবার মাঠ ছাড়েও ততোধিক দ্রুততার সঙ্গেই। বর্গটি সত্য, ন্যায় ও সামাজিক সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়—এসবের প্রতিষ্ঠায়ও নামে। আবার নাকের সামনে যশ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও জাগতিক লাভ-লোভের মুলা ঝুলিয়ে দিলে বর্গটির বড় অংশই পিঠটান দেয়। এই আলোচনা একেবারে নতুন তা-ও নয়। কার্ল মার্ক্স মধ্যবিত্তকে শ্রেণি না বলে 'লুম্পেন বুর্জোয়া' বলেছেন। কারণ, শ্রেণি হতে 'শ্রেণিচেতনা' লাগে। সেই গোষ্ঠীতাড়না এই বর্গটির মধ্যে নেই। উৎপাদনযন্ত্রেও তাদের ভূমিকা এক রকমের নয়, বরং বহুধাবিভক্ত ও বহুবিচিত্র। তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা ছাড়িয়ে তরতরিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই নিচে নেমে যাওয়া মেনে নিতে পারে না। দৈবক্রমে ঘটলেও না। যদিও তারা উঠে আসে ওই নিম্নবর্গ থেকেই। 'স্ট্যাটাস ক্যু' বা বহাল অবস্থা টিকিয়ে রাখার দুর্লঙ্ঘ্য তাগিদে তাদের চেষ্টাই এ রকম—ওপরে ওঠা না যাক, কোনোভাবেই যেন নিচে নামতে না হয়।

মধ্যদ্বিত্বের এই বৈপরীত্য রাজনীতির মাঠের মধ্যম বর্গকে স্বৈরাচারী ও লুটেরা বানায়, নতুবা স্বৈরাচারের সহযোগী বানিয়ে ছাড়ে। তারা 'টু বি অর নট টু বি', 'হব কি হব না', 'করব কি করব না', 'ঠিক হবে কি হবে না'-জাতীয়

দোদুল্যমানতার ধ্রুপদি দৃষ্টান্ত। তবে পশ্চিমে, বিশেষত কল্যাণরাষ্ট্রগুলোর মধ্যম বর্গ দোদুল্যমানতাসহ অন্য সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সে দিকটি বিবেচনায় নিলে মধ্যম বর্গটিও তিন রকমের : মধ্যবিত্ত (পশ্চিমে), মধ্যম বর্গ (এশিয়ায়, বিশেষত সার্কভুক্ত দেশগুলোতে) এবং মধ্যদ্বিত্ব (বাংলাদেশে)। বাংলাদেশের মধ্যম বর্গটি শুধু মধ্যদ্বিত্ব রয়েই যায়নি, মধ্যম বর্গ বা মধ্যবিত্ত হওয়ার রাস্তা থেকে ছিটকেও পড়ছে। এ অবস্থানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। মোটাদাগে এই নিবন্ধের পাদটীকাধর্মী সিদ্ধান্ত এই যে গণতন্ত্রহীনতাসহ বাংলাদেশ যে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে, তার পেছনে মধ্যদ্বিত্ব অনেকটাই দায়ী। 'শ্রেণি' ও 'বর্গ' ধারণা দুটিকে এই আলোচনায় পরস্পরনির্ভর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই স্থানে স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি প্রত্যয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি 'মধ্যদ্বিত্ব' আলোচনার প্রথম পর্ব। পরিচিতি পর্ব বা প্রাক্-বিশ্লেষণ পর্বও বলা যেতে পারে। পরবর্তী আরেকটি পর্বে 'বাংলাদেশের মধ্যদ্বিত্ব' বিকাশধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা থাকবে।

'রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড' দর্শন ও বিশ্বের মধ্যবিত্ত

রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড শিরোনামে একটি বই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বে বিপুল পাঠকপ্রিয় হয়েছে। বইটির মূল বক্তব্য মজাদার। মাঝারি চিন্তার বোকাসোকা, অনুদ্যোগী ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা মধ্যবিত্ত রয়ে গেলেন তো সব শেষ। আগামী দিনগুলো ভীষণ নাজুক হয়ে উঠবে মধ্যবিত্তের জন্য। তারা গরিব হয়ে পড়বে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানুষের ভালোমন্দ ভাবলে হবে না। তাতে ব্যক্তিগত ভালোমন্দ শিকেয় উঠবে। রবার্ট কিয়োসাকি ও রবার্ট লেকটার নামের দুজন লেখকের লেখা এই বই কোনো গবেষণাধর্মী জ্ঞানদানকারী বিদ্যা নয়। কিন্তু বইটির প্রচার-প্রচারণা ও দর্শনের আলোকে পাশ্চাত্যে 'স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট' নামে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মধ্যম আয়ের এক বিশাল জনগোষ্ঠী স্মার্ট ইনভেস্টর হতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বইটির সারকথা : 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' দর্শন ছাড়া স্মার্ট দর্শন আর কিছুই নেই। নিজের ভালো পাগলকেও বুঝতে হবে। নজর একদিকেই নিবদ্ধ করে রাখতে হবে। জানতে হবে, কোথায় কোন বিনিয়োগ লাভ আনবে। নজর রাখতে হবে পত্রিকার বাণিজ্য পাতায়, টিভির বাণিজ্য চ্যানেলে স্টক মার্কেটে দর ওঠা-নামার ধরনের দিকে।

কিয়োসাকি ও লেকটার অজস্র লেখা, সাক্ষাৎকার ও ভিডিও আলোচনা দিয়ে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়েছেন। তাঁদের এককাট্টা বক্তব্য এই যে, একবিংশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করতে হলে স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট দিয়েই চিনতে হবে। উন্নয়নতত্ত্ব, অনুন্নয়ন ও নির্ভরশীলতার ধ্রুপদি তত্ত্বগুলোর আলোচনাকালেও আমরা আধুনিকায়নের তাত্ত্বিকদের জেনেছিলাম ও চিনেছিলাম। তাঁরাও এ রকমই ভাবতেন যে আধুনিকায়ন হলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কানায় কানায় পূর্ণ হলে তার প্রভাবে অতিরিক্ত উন্নয়ন নিচে চুইয়ে পড়বে বা 'ট্রিকল ডাউন' হবে। অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভোগের অর্থনীতিও একটা অর্থনীতি। তবে সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে এ অবস্থান মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ, এ অবস্থায় সমাজ-সংগঠন ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন-ধারণ বোঝা কঠিন। সে কারণে সামাজিক সংস্কার বা মানবকল্যাণ বিষয়ে কার্যকর কোনো নীতিমালা তৈরি বা পরামর্শ প্রদানও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

কিয়োসাকি ও লেকটারের মনোভাব বইটির সংক্ষিপ্ত কলেবরে না আঁটলেও বইয়ের বাইরের আলোচনা-বিতর্ক থেকে স্পষ্ট। দেশ-সমাজ-মানুষ কিংবা নৈতিকতা-সামাজিক ন্যায়বিচার-শান্তি-সুস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে ভাবার জন্য রয়েছে রাষ্ট্র ও জনপ্রতিনিধিরা। বিনিয়োগকারী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী রাষ্ট্রের শিরা-উপশিরায় অর্থ সঞ্চালন করতে পারলে রাষ্ট্রও তাদের স্বার্থ রাখবে এবং ভালোমন্দের দেখভাল করবে। রাষ্ট্র তাদের ওপরই নির্ভরশীল হবে। তাই রাষ্ট্রকেই ছেড়ে দিতে হবে স্থান। বাজারে যারা টিকে থাকবে—যারা যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতম—রাষ্ট্র তাদের কথাই শুনবে। সেটিই স্বাভাবিক। পিছিয়ে পড়া, পরাজিত, অথর্ব, কর্মোদ্যোগহীন, অহেতুক মালটানা-ঠেলাটানা মেহনতিদের দুর্ভাগ্যের দায় তাদের নিজেদেরই। অস্কার লিউইস যেমনটি বলেছেন 'কালচার অব পোভার্টি'—দারিদ্র্যের সংস্কৃতি। দরিদ্ররা দারিদ্র্যের কারণেই নিজেদের আচার-আচরণে নানা রকম দারিদ্র্য আমদানি করে। তাদের আচরণগত কারণে দরিদ্রতা আরও বাড়ে। মধ্যবিত্ত পিছলে পড়ে ভুলেভালেও কখনো দরিদ্রের কাতারে পড়ে গেলে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে তাদের আরও বেশি তলিয়ে যেতে হবে। তখন উঠে আসার বা ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনারও বিনাশ ঘটবে। এমন মনোভাবই কিয়োসাকি ও লেকটারের নানা আলোচনায় কখনো স্পষ্ট, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্যে ছলচাতুরী নেই। তাঁরা সরাসরিই প্রশ্ন তুলছেন যে মধ্যবিত্ত কেন প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ধারক-বাহক ও উদ্ভাবক হওয়ার জন্য চেষ্টারত থাকবে না? অন্য যত রকম চাপই থাকুক না কেন, মধ্যবিত্তকে সবকিছুর আগে অর্থনৈতিক চাপ কাটিয়ে

ওঠার সক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। শুধু ধনিক গোষ্ঠী ও শিল্পোদ্যোক্তারাই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ করবে—এ রকম ধারণা ছেড়ে মধ্যবিত্তকে বিত্তনির্ভর জীবনধারা টিকিয়ে রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শন কীভাবে বিশ্বময় মধ্যবিত্তকে মধ্যদ্বিত্বে পরিণত করছে, বিষয়টি বুঝতে মধ্যবিত্ত ও মধ্যদ্বিত্ব ধারণায় আলোকপাত করা প্রয়োজন। দুনিয়ার মধ্যবিত্ত যে *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শনের ফাঁদে পড়েছে, তার বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থাপনের আগে মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্রেও আলোকপাত করা দরকার।

মধ্যবিত্ত, বিত্ত ও চিত্তসম্পর্ক

'মধ্যবিত্ত' শব্দটির শরীরে 'বিত্ত' শব্দটি লেপ্টে থাকায় স্থূল অর্থে 'মধ্যবিত্ত'র অর্থবান চেহারা আমাদের মানসে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত আসলে শ্রেণি নয়। কারণ, মধ্যবিত্ত কোনো অর্থনৈতিক বর্গ নয়। বর্গটি উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা-অমালিকানার ছকে পড়ে না। সোজা কথা, মধ্যবিত্তরা মালিকও নয়, শ্রমিকও নয়। তাদের শ্রেণিচেতনাও নেই। তারা পরিবর্তন বা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সংঘও গড়ে না। মার্ক্সীয় 'শ্রেণি' বিচারের ছকেও পড়ে না তারা। কার্ল মার্ক্স তাই তাদের খেতাব দিয়েছেন 'লুম্পেন বুর্জোয়া' বা নিম্নতর ধনিকমনা গোষ্ঠী বলে। মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞানীদের বিচারে তারা ধনিক নয়, উৎপাদনযন্ত্রে মালিকানাও নেই। তবে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ রয়েছে উভয়টিই অর্জন করার। তারা সেই অর্জনটিও চায় সহজসাধ্য ও অবৈপ্লবিক উপায়ে। কারণ, বিপ্লব-বিদ্রোহকে মধ্যবিত্ত বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা মনে করে।

মার্ক্সীয়দের সঙ্গে সহমত রেখে অমার্ক্সীয়রাও মনে করেন, মধ্যবিত্তের কতগুলো সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন তারা শহুরে বা শহরমুখী। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক থাকে তাদের। ফলে তারা শিক্ষিত ও সংবেদনশীল। বিশ্বের আনাচকানাচে কী ঘটছে, সেসব তথ্য জানা ও কাজে লাগানোয় তারা খুব পটু। ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের প্রতি তাদের অগাধ ভক্তি। সমাজপাঠ ও বিশ্লেষণে তারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সর্বোপরি, সংস্কৃতি-শিল্পকলা, নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশে বর্গ-সদস্যদের আগ্রহের কমতি হয় না। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত একটি সাংস্কৃতিক বর্গও বটে। ধনী ও দরিদ্রদের মাঝামাঝি সামাজিক অবস্থানে থাকায় শ্রেণিটি স্থিতিস্থাপক ও উদার। তারা দরিদ্রদের জীবনধারার সঙ্গেও পরিচিত, ধনীদের মনোভাব পাঠেও সক্ষম। ওয়েবারিয় ভাবধারা অনুযায়ী মধ্যবিত্ত অবশ্যই একটি 'শ্রেণি'। অমার্ক্সীয় ঘরানা,

বিশেষত ম্যাক্স ওয়েবারপন্থীদের বিচারে সব বর্গকেই শ্রেণি বলা যায়; তাতে দোষ হয় না। সে অর্থে মধ্যবিত্তও একটি শ্রেণি। তবে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলি ও ধীমত্তা এবং নমনীয় মধ্যমপন্থী অবস্থানের কারণে তাদের মধ্য থেকে সহজেই 'ব্যবস্থাপক শ্রেণি'র উদ্ভব ঘটে। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে পরিচালক, সংগঠক, আয়োজক এমনকি স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটে। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় যারা উঠে আসে, তারাও সামাজিক মধ্যম বর্গ থেকেই এসে থাকে। ফলে বিশ্বজুড়েই 'মধ্যবিত্ত' রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির অন্যতম প্রভাবক শক্তি। ওয়েবারও বর্গটিকে দেখেছেন একটি 'আইডিয়াল টাইপ' বা আদর্শ নমুনা হিসেবে। 'সিভিল সোসাইটি' আধুনিক মধ্যবিত্তের শাণিত ও সরব অংশ। তারাই 'আইডিয়াল টাইপ'। কারণ, তারা বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও দেশপ্রেমের আলোকে রাজনীতি এবং সমাজনীতিকে গণতান্ত্রিক ও জনবান্ধব করে তোলায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। (sievers 2010, Hodgkinson 2003)

'মধ্যদ্বিত্ব' : মধ্যবিত্ত-শ্রেণিচরিত্র

সামাজিক কাঠামো ও স্তরায়ন আলোচনায় সামাজিক বিজ্ঞান যথেষ্ট অগ্রগামী। তবু উনিশ শ ষাটের দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত সামাজিক স্তরবিন্যাসের ছকে মধ্যবিত্তের অবস্থান বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন ধারণা-দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিভক্তির কারণ, মার্ক্সীয় বিপ্লবপন্থীরা মনে করছিলেন, মধ্যবিত্ত বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিকর একটি বর্গ। কারণ, বর্গটি দ্বিচারী। দ্বৈততা, দোদুল্যমানতা ও সংশয় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোথাও লাভের বা অর্জনের সম্ভাবনা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায়ও তারা অতিরিক্ত সতর্ক। আগপাছ ভাবাভাবিতেই বেশি মত্ত থাকে তারা। তারা পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, পৃষ্ঠপোষক এবং তারা ধনিকপন্থী। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে মাঝারি অবস্থানে থাকায় তাদের সমাজসচেতনতাও মাঝারি মানের। উন্নত দর্শনের চর্চার বদলে স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে-পরে শান্তিতে দিন কাটানোর বাইরে তাদের বড় কোনো লক্ষ্য বা ভুবনদৃষ্টি নেই।

মধ্যবিত্ত মাঠের বিপ্লবী রাজনীতির মাধ্যমে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বদলে নিজেদের টিকে থাকাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। স্বার্থপরতাই তাদের বৈশিষ্ট্য। নিম্নবর্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা তাদের তাড়িত করে না। তারা আপসকামী। দুর্নীতিতেও সমান পারদর্শী।

বিপদ দেখলেই সটকে পড়ে। সর্বোপরি তারা অনির্ভরশীল ও অনির্ভরযোগ্য। আন্দোলন-সংগ্রামে টিকে থাকার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাদের নেই। যেকোনো প্রলোভনে তারা নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দেয়। নিজের স্বার্থ ও জাগতিক সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাপ্তির পেছনে ছোটে তারা। লাভ-ক্ষতির হিসাব কষা তাদের মজ্জাগত। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনে নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণের বেলায় তারা অনুদার। এই শ্রেণিচরিত্র চিত্রণের আলোকে মধ্যবিত্তকে 'মধ্যদ্বিত্ব' বলা চলে। কার্ল মার্ক্স মনেও করতেন পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে চেষ্টা করলেও বুর্জোয়ার স্থান দখল করা সম্ভব নয়। এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্ক্স এদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শুধু নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। '…all these fights against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class' (Marx & Engels 1975 :394-95)। মার্ক্স আরও লিখলেন, 'not revolutionary but conservative, Nay more, they are reactionary, for they try to roll back the wheel of history' (ibid)—এই শ্রেণি রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। তারা বিপ্লবী তো নয়ই, বরং ইতিহাসের চাকাকে পেছনে *ঠেলে* দিতে চেষ্টা করে।

মধ্যবিত্তের মধ্যদ্বিত্বে রূপান্তরের সাম্প্রতিক ধরন

রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড দর্শন অনুযায়ী মাঝারি আয়রোজগার নিয়ে টিকে থাকার চাপ সইতে পারার জন্য প্রাণপাত করতে থাকা জনগোষ্ঠীটিই মধ্যবিত্ত। তাদের নিরন্তর দৌড়ঝাঁপ 'বিত্ত' সম্পর্কিত। তাই এই পর্যায়ে তাদের 'মধ্যবিত্ত' বলতে আমাদেরও আপত্তি নেই। জোসেফ স্টিগলিৎজ বা অমর্ত্য সেন উন্নয়ন অর্থনীতি আলোচনায় কিয়োসাকি-লেকটারের বয়ানকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে আলোচনায় আনেননি, এড়িয়ে গিয়েছেন। অর্থনীতিবিদদের বেশির ভাগই মনে করেন, লোক দুটি ফাটকাবাজ এবং তাঁদের পাত্তা দেওয়ার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শনের সামাজিক প্রভাব আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, দর্শনটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে 'মধ্যদ্বিত্ব' বিকাশের অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে, সেটি বুঝতে হলে কিয়োসাকি-লেকটার প্রকল্পের অন্যতম একটি প্রায়োগিক দিক 'পিরামিড স্কিম'-এর কয়েকটি উদাহরণ টানা যেতে পারে।

মার্ক্সীয় ধারায় আমরা 'মধ্যদ্বিত্ব' ধারণা ব্যবহার করে দেখছি কিয়োসাকি-

লেকটারের দর্শনের বিপদ। এই দুজন একবিংশ শতকের শুরু হতেই মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বা এমএলএম ধারণাটিকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তুলেছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই নেটওয়ার্কিং ব্যবসা বা এমএলএম ব্যবসায় লগ্নিকারী হতে গিয়ে একদল মানুষ সর্বস্ব খুইয়েছে। লগ্নিকারীদের সিংহভাগ মধ্যবিত্ত ও উঠতি মধ্যবিত্ত। বাংলাদেশের ডেসটিনি এবং ইভ্যালির ব্যবসাপদ্ধতি কিয়োসাকি-লেকটার মডেলের একটি উদাহরণ।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশেই কয়েক হাজার এমএলএম কোম্পানির অস্তিত্ব মিলেছিল গত বছর। অথচ ২০১৩ সালেই ৭৮টি কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছিল (*প্রথম আলো* ২০১৩)। 'পিরামিড স্কিম' নাম পেয়েছে এই ব্যবসাপদ্ধতি। এর মূল দর্শন কাঁচা টাকার লোভ বাড়াতে হবে। এর পদ্ধতি একজন নয়, শত এবং হাজার ছাড়িয়ে অসংখ্য মানুষকে লগ্নিকারক বানাতে হবে। তারাই আবার ভোক্তা হবে। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের একাংশ নিজেরাই কিনবে ও ভোগ করবে। তারা নিজেরাই আবার চলমান বিজ্ঞাপন। নতুন ভোক্তা-লগ্নিকারক খুঁজে পাওয়ার বিদ্যা করায়ত্ত করতে হবে। খুঁজে পেলেই চলবে না। তাকে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে এবং ভাষার কারুকার্যে বিমোহিত করা শিখতে হবে। তার বিশ্বাস অর্জন করার কৌশলই নয়, তাকে লগ্নিকারক হওয়ার লাভ দেখিয়ে যতটা সম্ভব লোভী করে তুলতে হবে। মধ্যম আয়ের মানুষদের লোভী করে তোলার এসব 'পিরামিড স্কিম' বিশ্বময় কোটি কোটি উঠতি মধ্যবিত্ত ফড়িয়া তৈরি করেছে। তাদের বড় অংশই জমিজিরাত খুইয়েছে। ২০১৯ সালে হায়দরাবাদে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তদন্ত করে জেনেছে যে মাত্র দুটি এমএলএম কোম্পানি ভারতে ৬০০০ কোটি রুপির প্রতারণা করেছে (Sudahakar 2019)

যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাসচেতনতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ড. জন টেইলর ২০১১ সালে দীর্ঘ প্রতিবেদনে দেখালেন যে এই বহুজাতিকেরা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে ব্যবসা চালিয়ে যায়। মার্কিন সিনেটরদের বড় অংশ এবং দুটি বড় দলই এমএলএম করপোরেশনগুলো থেকে বড় অঙ্কের অর্থসহায়তা পায়। ভুক্তভোগীদের নব্বই ভাগের বেশি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে দ্রুত মধ্যবিত্ত হয়ে উঠতে চাওয়া জনগোষ্ঠী। এদের ক্ষুদ্র অংশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিম্ন আয়ের মানুষজন (Taylor 2011)। আশঙ্কার বিষয়, বড় বড় এমএলএম কোম্পানি অর্থনীতিতে গবেষণা বৃত্তি দিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ফরমায়েশি গবেষণাপত্র তৈরি করা। প্রশস্তিমূলক গবেষণাপত্রগুলোতে দেখানো হয়, অর্থনীতিতে এমএলএম কোম্পানিগুলোর অসামান্য অবদান। বিশেষত মধ্যবিত্তদের জন্য অসংখ্য কর্মসংস্থানের বয়ানে

ভরপুর থাকে প্রতিবেদনগুলো। যাঁরা বৃত্তি ও অর্থসহায়তা পেয়ে থাকেন, তাঁদেরও প্রায় শতভাগই মধ্যবিত্ত।

কিয়োসাকি ও লেকটারের নয়া-উদার বাজারি চিন্তার বিকাশ বিশ্বায়নের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। ভাবনাটি একেবারে নতুনও নয়। ১৯৫০ সালের দিকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'পিরামিড স্কিম' লগ্নি ব্যবসা। এই ব্যবসার মাধ্যমেই বিশ্বের অন্যতম বড় বহুজাতিক কোম্পানি হার্বাল-লাইফ, এভন, এমোয়্যেসহ আরও বেশ কয়েকটি দানবাকৃতির ব্যবসা বিশ্ববাজারে ঠাঁই করে নেয়। যে তিনটি বহুজাতিকের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের বার্ষিক মুনাফা গড়ে কুড়ি বিলিয়ন ডলার (Halim-Jashua 2019) বাণিজ্য তাদের মূল লক্ষ্য। 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' মূল দর্শন। নিজের পকেট তাজা থাকলে বাজার তাজা থাকবে। গত কুড়িটি বছরে ধনী-দরিদ্র সবাই দেশেই উঠতি মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ এই আরাধ্য স্রোতের যাত্রী হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্তের একাংশের বিভ্রান্তি বেড়েছে। লগ্নি না করে তারা ভুল করছে বা পিছিয়ে পড়ছে কি না, এই ধন্দ ও অস্থিরতা তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এই বিষয়ে দেশে-বিদেশে তেমন গবেষণা নেই। কারণ, মধ্যবিত্তের চিহ্নিত হয়ে পড়ায় অনাগ্রহ।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ডেসটিনি, ইভ্যালিসহ এমএলএম ব্যবসায় লগ্নিকারী কতজন মধ্যবিত্ত নিঃস্ব হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণা এখনো হয়নি। একই অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।

আত্মোন্নয়ন বাণিজ্যের বলি বিশ্ব মধ্যবিত্ত

বিশ্বময় আত্মোন্নয়ন-বাণিজ্য শিল্পে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশেও। সহজবোধ্য করে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক। 'মোটিভেশনাল স্পিচ' বা 'উদ্দীপনামূলক ভাষণ'-এর বাজার রমরমা। এগুলোর লক্ষ্য হতাশ ও আত্মবিশ্বাসহীন মধ্যবিত্ত। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও আত্মোয়ন্নয়নমূলক বইয়ের প্রকাশনা ও বাজার প্রকাশনা জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থকরী ও লাভজনক। জন লারোসা মার্কেটডেটা এলএলসি নামের বিশ্বখ্যাত বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এবং 'হানড্রেড প্লাস ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড মার্কেট স্টাডিজ'-এর রচয়িতা। চমকজাগানিয়া সাম্প্রতিকতম গবেষণায় তিনি দেখান, ২০২০ সালে কোভিডের কারণে বই ব্যবসায় ধস নামার পরও আত্মোন্নয়নমূলক বইয়ের প্রকাশকেরা মুনাফা করেছেন ১০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্কেটডেটার ভবিষ্যদ্বাণী : প্রতিবছর ৬ শতাংশ হারে এই খাতে প্রবৃদ্ধি ঘটবে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই খাতটি বার্ষিক

১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মুনাফার বাজারে পরিণত হবে। পাঁচ হাজারের বেশি মোটিভেশনাল স্পিকারের বার্ষিক আয় কমপক্ষে ১.৬ বিলিয়ন ডলার। এসব কর্মকাণ্ডের প্রধান ভোক্তা মধ্যবিত্ত। (LaRosa 2021)

আত্মোন্নয়নের চেষ্টাই বলে দেয় মধ্যবিত্ত দিকনির্দেশনাহীনতায় বেশি ভোগে। ইউরোপিয়ান কমিশনের সহযোগিতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গত বছরের গবেষণা অনুযায়ী বিশ্বে বিষাদ-বিষণ্নতায় আক্রান্ত মানুষের ৮০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের জনগণ। ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'I can, therefore I must : Fragility in the upper-middle classes' শিরোনামের একটি গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনজন মনোবিজ্ঞানী জানান যে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের বিশেষত তরুণ যুবাদের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি। তাদের আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে, মনোবল ভঙ্গুর। অনিশ্চয়তা ও অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় তাদের মধ্যে ব্যাকুলতা বেশি। বিপন্নতাবোধের পেছনে বয়স বা মাদকের প্রভাবের চেয়ে বেশি দায়ী মধ্যবিত্তসুলভ আত্মবিশ্বাসহীনতা ও বর্তমান অবস্থান থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠা থেকেই কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যহানির ঘটনা ঘটে। তার পেছনের কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের দোদুল্যমানতার চাপ। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা মধ্যবিত্তসুলভ নীতিনৈতিকতা এবং মূল্যবোধের জোয়াল কিশোর-কিশোরীদের কাঁধে তুলে দেয় বটে, নিজেদের বেলায় তার ব্যত্যয় ঘটায়। সেসব আচরণের বৈপরীত্য কিশোর-কিশোরীদের নজর এড়ায় না। ফলে তারা কোন আচরণটি কাম্য, কোনটি কাম্য নয়—এ বিষয়েও স্বাভাবিক স্থিতিশীল অবস্থান নিতে পারে না। (Luthar, et. al., 2013)

মধ্যদ্বিত্বরা আশঙ্কাজনকভাবে রাজনীতিবিযুক্ত

পশ্চিমের প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর ম্যানিফেস্টোতে 'মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষা' ধারণাটি জোর দিয়ে উল্লেখ করা থাকে। রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট, কনজারভেটিভ-লিবারেল—সবারই লক্ষ্য মধ্যবিত্ত ভোটারদের টাকাপয়সার জোগান ও স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত রাখা। তাদের সন্তুষ্ট রাখা। কারণ, পশ্চিমের দেশগুলোর উন্নয়নের মূল ক্রীড়নক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যম বর্গটি স্থিতিস্থাপক। মার্ক্সীয় বিপ্লবতত্ত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজস্ব পদ্ধতিতে দরিদ্র এবং ধনী উভয় বর্গের সংখ্যা কমিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। সামাজিক বিপ্লবে-বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর করতে ধনী ও দরিদ্র

শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার ছিল। সেটি তারা করতে সক্ষমও হয়েছিল। এ বছরের ২২ জুলাই *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় হেদার কক্স রবিনসনের নিবন্ধটির কথা ধরা যাক। নিবন্ধের শিরোনামটিই ছিল Biden is trying to rebuild America's middle class. Our lopsided economy needs it (Cox 2022)। এত কিছুর পরও লাভ হচ্ছে না। *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শনে আচ্ছন্ন অর্থনৈতিক আত্মোন্নয়ন ছাড়া অন্য কিছুতেই সংযুক্ত হতে পারছে না তারা। এত চেষ্টার পরও মধ্যবিত্ত আরও বিকশিত হওয়ার বদলে হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত পিউ সেন্টারের ২০২১ সালের গবেষণার সিদ্ধান্ত—মধ্যবিত্ত সংকুচিত হয়ে আসছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭১ সালে জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত। ২০২১ সালে কমে সেটি দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে (Ortega 2022)।

একটি বিষয় স্পষ্ট। বিশ্বায়নকালে মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন বিত্তের উন্নয়ন, চিত্তের উন্নয়ন নয়। মধ্যবিত্ত ক্রমশই রাজনীতি ও সমাজচিন্তা-বিযুক্ত বর্গের রূপ নিচ্ছে। উইলিয়াম ডারল্যান্ড দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র পতনোন্মুখ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বিশ্বের প্রায় সব দেশেই মধ্যবিত্ত যুবসমাজ বিত্তচিন্তায় অস্থির। তারা একান্তই রাজনীতিবিমুখ (Durland 2017)। শ্যারন গোল্ডম্যানের একটি গবেষণায় আরেকটি সত্যও উঠে এসেছে। চিরকাল মধ্যবিত্তের চিত্ত-প্রশান্তির মূল কারণ উচ্চশিক্ষা। অথচ বর্তমান সময়ে বিশ্বময়, বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগামী মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিদিনই কমছে (Goldman 2013)। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার চাকরির বাজারবিষয়ক পরিসংখ্যান বলছে, 'ওয়ার্কিং ক্লাস' হিসেবে অন্তর্ভুক্তদের নব্বই ভাগের বেশি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্য। তাদের পরিচিতি 'পে-চেক টু পে-চেক কমিউনিটি মেম্বার্স' (Hayes et al., 2022)। সম্প্রতি 'হারিয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি' (ডিসঅ্যাপিয়ারিং মিডল ক্লাস) কথাটা আহাজারির মতো করে নিয়মিত শোনা যাচ্ছে। অর্থনীতির পেছনে দৌড়াতে গিয়ে অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয় ময়দান থেকেই মধ্যবিত্তের বিযুক্তি নির্দেশ করা এই শিরোনাম পাশ্চাত্যে রাজনীতিকদের মুখেও উঠে এসেছে (Daugherty 2021).

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অন্যতম নির্বাচনী ওয়াদা ও রূপকল্পের (Vision) একটি আন্তর্জাতিক নীতি অবাক করার মতো। এটিকে মূলনীতিও মনে করে ডেমোক্র্যাটরা। ভিশনটির মূল কথা 'ফরেন পলিসি ফর দ্য মিডল ক্লাস'। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মধ্যবিত্তের উন্নয়ন বাইডেনের লক্ষ্য কী রকম হতে পারে? যুদ্ধ নয়, গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য চেষ্টা নয়, সামরিক

শাসনের কবল থেকে উদ্ধার পেতে সহায়তা দেওয়া নয়, দুর্ভিক্ষ-ক্ষুধামুক্তি নয়—পরদেশে মধ্যবিত্তের উন্নয়নই লক্ষ্য? অন্তর্গত মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, বাইডেনের এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই, উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই 'মধ্যবিত্ত'বিষয়ক ভাবনা উসকে দিয়েছে। কারণ, নির্বাচনে জিতে সত্যি সত্যিই তিনি 'করপোরেট কর সংস্কার'-এর কাজে হাত দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, নিজ দেশে ধনীদের কর ফাঁকি দেওয়ার পক্ষে কাজে লাগা আইনকানুন থেকে শুরু করে অন্যান্য পদ্ধতির রশি টেনে ধরা। উদ্ধার করা বিশাল অঙ্ক মধ্যবিত্তের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, আবাসন সংস্থানের কাজে লাগানো। তবু লাভ হচ্ছে না।

মার্কিন প্রভাবে গত বছরের শেষ দিকে কুড়িটি শিল্পোন্নত দেশের মহাসম্মেলনে (জি-২০ সামিট) 'আন্তর্জাতিক করপোরেট কর সংস্কার চুক্তি'সহ নীতিমালাও গৃহীত হয়। চুক্তিটি অভিনব। উদ্দেশ্য ধনীদের চুরি বন্ধ করা অথবা কমিয়ে আনা এবং বাঁচিয়ে আনা অর্থ বিশ্বের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে ব্যবহার করা। এই আলোকে নভেম্বরে *ফরেন পলিসি* পত্রিকায় বিখ্যাত ইয়েল ল স্কুলের গবেষক টিম হার্শেল বার্নস প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখলেন যে পরদেশের মধ্যবিত্ত উন্নয়নের পেছনে ক্ষমতা, অর্থ ও শক্তির অপচয় ঘটাতে গেলে মার্কিন মধ্যবিত্তের উন্নয়নই ব্যাহত হবে। দুনিয়াময় সব দেশের জন্য 'ন্যূনতম করপোরেট ট্যাক্স' নীতি গ্রহণেরও চাপ রয়েছে। উচ্চ মুনাফা ও সুদের আশায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ধনীরা অফশোর ব্যাংক ও উন্নত দেশের লাভজনক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করে। বার্নস হিসাব কষে দেখালেন যে 'ন্যূনতম করপোরেট ট্যাক্স' নীতিতে দেশগুলো রাজি হলে অতিরিক্ত অর্জিত অর্থ লগ্নিকারক দেশগুলোর মধ্যবিত্তদের কোনো কাজে না এসে জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিকে লাভবান করবে। তিনিও দেখালেন, মধ্যবিত্তকে রাজনীতিতে যুক্ত করার চেষ্টা করা হলেও বর্গটি অর্থনৈতিক আত্মোন্নয়নের ফাঁদে এমনভাবে আটকা পড়েছে যে তাদের আর অন্যদিকে তাকানোর ফুরসতও নেই। এদিকে যে 'সিভিল সোসাইটি' ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারত, তারাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। সিভিকাস নামের সিভিল সোসাইটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির একদল গবেষক বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে ও ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে সিভিল সোসাইটি কর্মকাণ্ডের আলোকে দেখিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রগুলোতে সিভিল সোসাইটি মৃতপ্রায়। ফলে মধ্যবিত্তের মেধাজাগতিক অবদানও পড়তির দিকে। সক্ষম মধ্যবিত্তের জন্য সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণও দুরূহ হয়ে পড়েছে (Perera et. al., 2019)। এসব কারণেই কিছু প্রশ্ন তোলা জরুরি।

‘রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড’ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ‘মধ্যবিত্ত’ প্রশ্ন

তাহলে কিছু প্রশ্ন তোলা দরকার নয় কি? বিশ্বজুড়ে মধ্যবিত্তের পরিচিতি কি আসলেই মাত্র দুধারি? ‘হয় রিচ ড্যাড হতে হবে, নয়তো পুওর ড্যাড থাকতে হবে’? সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, জীবনজটিলতা, অস্থিরতার জন্য যাঁরা যাঁরা স্মার্ট ইনভেস্টর হতে পারবেন না, বিপর্যস্ততার দোলাচলই কি তাদের নিয়তি? আয়রোজগারের সক্ষমতা বিচারেও তাদের জন্য মাঝামাঝি কোনো বর্গে থাকা কি নিরাপদ নয়? মাঝারি আয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানেই কি বিপন্ন হয়ে পড়া বা দরিদ্র হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা? মধ্যবিত্তকে কি ‘বিত্ত’ দ্বারাই পরিচিত হতে হবে? চিত্তসৌন্দর্য, সমাজভাবনা, মানবহিতৈষী সামাজিক দায়বোধ, সমাজ-সংস্কারচিন্তা ও কর্মোদ্যোগ—এগুলো কি করের অর্থে রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আসলেই করা সম্ভব? রাষ্ট্রকে অতটা ক্ষমতাবান করে তোলার মাধ্যমে অতিক্ষমতায়িত সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র নির্মাণ করা গেলে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী কীভাবে বেশি উপকৃত হবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগশোকের কারণে মাঝারি আয় ও সামাজিক অবস্থানের বর্গটি বিপর্যস্ত হলেও সেই দায় কি তাদেরই, যারা দুর্বিপাক মোকাবিলায় অক্ষম রয়ে গেছে? এই ‘ব্লেইমিং দ্য ভিকটিম’ বা বিপন্নকেই দোষী করার প্রবণতা কতটা মানবিক? তাদের বিপর্যয়কালে অতিক্ষমতাধর সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রাতা হিসেবে আবির্ভাবের কোনো দায়িত্ব ছিল না কি? মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিলুপ্তি কি আসলেই কাম্য সমাজ গড়ে তুলবে? সবশেষে দক্ষিণ এশিয়ায় এবং বাংলাদেশের বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত বর্গে *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শন অভিযোজনের পরিণাম কী হতে পারে?

‘মধ্যদ্বিত্ব’ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের এশীয়-বাস্তবতা ও বাংলাদেশ

প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতবর্ষের মার্ক্সবাদীদের মধ্যবিত্তবিরোধী অবস্থান অতীতেও যেমন ছিল, এখনো তেমনই আছে। রমাপদ চৌধুরী লিখেছিলেন ভারতবর্ষের ‘মধ্যবিত্ত’ কোনো দল বা শ্রেণি নয়। এটি একটি ‘মানসিকতা’। বনফুল *মধ্যবিত্ত* নাটকে দেখালেন মধ্যবিত্তের উন্নাস ও স্বজন-সমাজ থেকে বিযুক্ত থাকার আকুতি। আমাদের গল্প-উপন্যাসে, সাহিত্যে মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণও অনেকটাই ষাটের দশকের মার্ক্সবাদীদের মতো। নীতিকথা ও নৈতিকতার তুবড়ি ফোটানো মানুষেরা মুহূর্তেই উল্টো আচরণ করছেন। দুর্নীতি-দুরাচারেও মধ্যবিত্ত পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সব রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক আন্দোলনে ‘মধ্যদ্বিত্ব’ চরিত্রের প্রতিফলন দিনের আলোর মতো জ্বলজ্বলে।

স্বৈরাচারী সামরিক সরকারগুলোর শাসনকালের পুরো সময়েই দেখা গেছে, রাজনৈতিক মধ্যবিত্ত নীতিনৈতিকতা জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করছে না। বর্তমান সময়েও মধ্যবিত্তনির্ভর রাজনীতির লুটেরা ও সুবিধাবাদী চরিত্রই জ্বলজ্বলে।

কারণও বোধগম্য। প্রাচ্যের মধ্যবিত্ত এখনো উত্থানপর্বই সমাপ্ত করে উঠতে পারেনি। প্রতিদিনই মধ্যবিত্ত বিকাশের একেকটি শর্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ভারত উপমহাদেশে 'মধ্যবিত্ত' বিকাশের একটি সাধারণ ছক আছে। একটি ছক বহুল প্রতিষ্ঠিত। সেটি এই যে ব্রিটিশ শাসনের আগে এই উপমহাদেশে মধ্যবিত্ত বিকশিত ছিল না। পাল যুগ, সেন যুগ, সুলতানি আমল এবং মোগল আমলেও রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র বিদ্যমান থাকলেও মধ্যবিত্ত বিকশিত ছিল না। পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যে রেনেসাঁ বা শিল্পবিপ্লবের শর্ত তৈরি হয়নি। সামন্তবাদের ধস এবং পুঁজিবাদের উত্থানেরও কার্যকারণ ছিল না। প্রাচ্যের কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শতবর্ষের পর শতবর্ষ অনেকটাই অপরিবর্তিত ছিল। পাশ্চাত্যের ফরাসি বিপ্লবের মতো কোনো রাজনৈতিক সংস্কারের তোড়ে মধ্যবিত্তের উত্থানের সমান্তরাল কোনো ঐতিহাসিক আলোড়ন-বিলোড়নও নেই। ১৭৫৭ সালের পরপরই ব্রিটিশ প্রভাবিত ভারতে মধ্যবিত্ত বিকাশের ধরনটি ছিল একরৈখিক, সামাজিক নয়। 'দারুল হারব' বা বিধর্মী রাজ্য ঘোষণার মাধ্যমে অভিমানাহত মুসলমানদের ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষাবিরোধী অবস্থান পরের শতবর্ষজুড়ে এই জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করেছিল। সে সুযোগে অমুসলমান জনগোষ্ঠী এগিয়ে গেলেও তাদের কদম ছিল সতর্ক। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইউরোপীয় আদলে ভারতীয় নব্য সামন্তবাদের জন্ম দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের উত্থানের সম্ভাবনা আরও দূরে সরিয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনে ধনী ও দরিদ্র উভয় গোষ্ঠীর জন্ম হলেও মধ্যবিত্ত বিকাশের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হয়। সে কারণে ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভের পরও মধ্যবিত্তশ্রেণি বিকাশের ক্ষেত্রই প্রস্তুত হচ্ছিল মাত্র; তাদের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব আরও পরের বিষয়।

ঊনবিংশ শতকের কুড়ি ও তিরিশের দশকে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও ফরায়েজি আন্দোলন সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে তুললেও আন্দোলনগুলো রাতারাতিই সর্বজনগ্রাহ্য বা পছন্দনীয় হয়ে ওঠেনি। আন্দোলনগুলোর অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষের সন্দেহপরায়ণতা, ধর্মীয় বাধা, কূপমণ্ডূকতা এবং পূর্বসংস্কারজনিত দ্বন্দ্ব। ১৮৩৫ সালে মেকেলের ভাষা সংস্কার এবং ইংরেজিভাষী ভারতীয় গড়ে

তোলার বিষয়টিকে যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়, বাস্তবে তা ১৮৫৭ সালের আগে প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠেনি। মেকেলে মিনিটস প্রয়োগের আয়োজন ও নানা বিতর্ক সামলানোর ডামাডোলের মধ্যেই ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই ২২ বছর সময়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মধ্যবিত্ত বিকাশের দালিলিক প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে মেকেলের ভাষা-শিক্ষা-দর্শন প্রকাশের কয়েক বছর আগে থেকেই হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের বদৌলতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বিকাশের শর্ত তখনো অঙ্কুর পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিকাশপর্বের শুরু সিপাহি বিপ্লবের মাধ্যমেই। সে সময় থেকেই ভারতীয় চরিত্রের স্বদেশি মধ্যবিত্তের বিকাশের প্রয়োজন অনুভবের সূত্রপাত। সিপাহি বিদ্রোহ জাতীয়তাবাদী ভাবনা উসকে দিলে রাজনীতিভাবনাও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নিম্নমধ্যবিত্ত রয়ে যাওয়া ও শিক্ষিত হতে চলা তরুণদের মধ্যবিত্ত বনে যাওয়ার পথচলাও শুরু হয়। একই সময়ে নেতৃত্ববোধও বিকশিত হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালাভের পরও সেগুলো উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দু এবং উচ্চবর্গের ধনী মুসলিম এলিটদের নেতৃত্বাধীন রয়ে গিয়েছিল।

পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত বিকাশের সময়কাল আরও সাম্প্রতিক। বয়স বড়জোর ৭২ বছর। প্রথম ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ছিল প্রথম ক্রীড়নক। কিন্তু মূলধারাকরণ হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লাভ একটি বড়সড় সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর দেশ বিভাজন-পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিভাজন ও বিভেদের রাজনীতির কারণে মধ্যবিত্তের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি তখনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয় নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটি মানসচিত্র কৃষিনির্ভর পূর্ব পাকিস্তানকে নগর-সংযোগে শুধু সাহসীই করেনি, গ্রামীণ নিম্ন ও নিম্নবিত্তদের শহরে স্থানান্তর, অভিগমন ও আবাস সৃষ্টিতে আগ্রহী করে তুলেছিল। করেছিল শিক্ষাদীক্ষা ও অকৃষিজ জীবনধারামুখী। ধীরে হলেও মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠছিল সেই সময়। তবে মধ্যবিত্ত বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পরপরই। এই বাস্তবতাকে আমলে নিলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়েছে মাত্র ৫২ বছর আগে। অন্যভাবে বলা চলে বাংলাদেশি মধ্যবিত্তের উত্থানপর্ব এখনো শেষই হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনাধীনে বাংলাদেশে শিল্প-কলকারখানার বিকাশ ঘটলেও মধ্যবিত্ত বিকাশের শর্ত ছিল না বলা চলে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের হয়তো উদ্দেশ্যই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে একটি শ্রমজীবী শ্রেণি গড়ে তোলা। একটি 'রিজার্ভ আর্মি অব লেবার' সৃষ্টি করা। তাদের সে উদ্দেশ্যটিও সফল হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরোনোর পরও দেশে সস্তা শ্রম আর বিদেশে শ্রম রপ্তানি দেখায় যে 'রিজার্ভ আর্মি অব লেবার' সৃষ্টি করার নীতি স্বাধীন দেশেও কার্যকর। অন্যদিকে লাগাতার গণতন্ত্রহীনতার কারণে শিক্ষিত, রাজনীতিসচেতন ও জনবান্ধব মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠেনি। সংশয়গ্রস্ত ও প্রভাবহীন একটি 'মধ্যদ্বিত্ব' সিভিল সোসাইটির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব মাঝেমাঝেই টের পাওয়া যায় যদিও।

উপসংহার

'মধ্যবিত্ত' আলোচনার পরিসরটি ব্যাপক। ষাটের দশকে সমাজতন্ত্রপন্থীদের মধ্যবিত্তবিরোধী অবস্থান পাশ্চাত্যে হালে পানি পায়নি। মার্ক্সবাদীরা মধ্যবিত্তের যে 'মধ্যদ্বিত্ব' শ্রেণিচরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি পাশ্চাত্যে ষাটের দশকের অকাট্য বাস্তবতা ছিল না। ষাটের দশকের উন্মাতাল ছাত্র আন্দোলন, যুবক-যুবতীদের সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন, বর্ণবাদবিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন—সবকিছুর নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিল মধ্যবিত্ত তারুণ্য। বঞ্চিত ও নিম্নবর্গের জনগণ সার বেঁধেছিল তাদের নেতৃত্বের পেছনেই। পশ্চিমা সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যায়েও রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতে। নর্ডিক দেশগুলোতে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো সে সময়। ধনী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বদলে রাষ্ট্রচরিত্র নির্মিত হতে থাকল মধ্যমপন্থী রাষ্ট্রদর্শন ও মধ্যম আয়ের মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে। সুতরাং সমাজবাদী, মানবিক ভাবনার সংশ্লেষে শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠেছিল পশ্চিমে। তবে উল্লেখ্য, মার্ক্সীয় মধ্যবিত্ত চরিত্র বিশ্লেষণ পাশ্চাত্যকে উপলক্ষ করার বদলে বৈশ্বিক বাস্তবতাকেই অবলম্বন করেছিল। ষাটের দশকের পশ্চিম মধ্যদ্বিত্বমুক্ত হলেও তাদের সাম্প্রতিক জীবনধারা মধ্যবিত্তীয় নয়, মধ্যদ্বিত্বীয়। *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শন আবারও মধ্যবিত্তকে 'মধ্যদ্বিত্ব' বর্গের রূপ দিচ্ছে।

বিশ্বায়ন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যদ্বিত্বদের বিত্তগত দূরত্বটি ঘুচিয়ে দিয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশও বিশ্বসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তও *রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড* দর্শনে প্রভাবিত। এটি বিশ্বময় নৈতিক শূন্যতার সংকট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এখনো অবিকশিত ও উঠতি স্তরে

রয়ে গেছে। নাগরিক সমাজের ভূমিকাহীনতা বাংলাদেশের মধ্যবিত্তকে দিকনির্দেশনাহীন একটি বর্গে পরিণত করছে। এই প্রবন্ধে মধ্যম বর্গের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র বা আচরণধারা বোঝাতে 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যবিত্তকে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী ভেবে নেওয়ার চিরাচরিত চর্চাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করাও প্রবন্ধটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, মধ্যবিত্ত যতটা না মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী, তার চেয়ে অনেক বেশি এটি একটি 'মানসিকতা' ও 'অনুভূতি'। বর্গটিকে 'শ্রেণি' বলার সুযোগও কম। তাই এই আলোচনায় 'বর্গ' প্রত্যয়টিই ব্যবহার করা হয়েছে। 'মধ্যবিত্ত' প্রত্যয়টিকে খারিজ করে দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক বর্গচরিত্র আছে, শ্রেণিচরিত্র নেই। একই ধরনের ভুবনায়ননির্ভর অর্থনীতির চাপে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় জগতেই মধ্যম-বর্গটি 'মধ্যদ্বিত্ব'র রূপ নিচ্ছে।

এই উপমহাদেশে মধ্যবিত্ত বিকাশের প্রতিষ্ঠিত কালানুক্রমিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা রয়েছে। এত দিন সেগুলো প্রায় বিনা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে এসেছে। বর্তমান সময়ে এসে আমরা কিছু প্রশ্ন তুলছি। কারণ, অখণ্ড ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের বিকাশের ধরনধারণ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত বিকাশের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত বিকাশের যথেষ্ট অমিল রয়েছে। মেকেলের ইংরেজি শিক্ষা, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং স্বদেশি ও সমাজতন্ত্রী ভাবধারার প্রভাব, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদবিষয়ক অতিপরিচিত বয়ানগুলো দ্বারাই উভয় অঞ্চলের মধ্যবিত্ত বিকাশের ধারণাটি বিদ্বৎমহলে এখনো সচল। এসব ব্যাখ্যায় সাতচল্লিশের দেশবিভাগ-পূর্ববর্তী সময়কে অনেকটা বিস্তারিতভাবে ধারণ করা আছে। দেশবিভাগ-পরবর্তী মধ্যবিত্তের বিকাশ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশ আন্দোলনের ভূমিকা গবেষণার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে যথেষ্ট বা সন্তুষ্ট হওয়ার মতো মনে করার কারণ নেই। খোলা চোখে দেখা অনুভবের আলোকে বলা যায় যে নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন-পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন এবং বেশি 'মধ্যদ্বিত্ব' চরিত্রসম্পন্ন। এ বিষয়েও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

● **হেলাল মহিউদ্দীন** অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়; রিসার্চ ফেলো, সেইন্ট পলস কলেজ, ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা।

তথ্য নির্দেশিকা

Arief Halim—Joshua 2019. Multi-level marketing companies profit off of economic exploitation. The Titan. California State University. March 19. Retrieved on 21 September, 2022.

Daugherty, G. and R. Kelly 2021. America's Middle Class Is Losing Ground Financially. Retrieved on 8 September 2022. https ://www.investopedia.com/insights/americas-slowly-disappearing-middle-class/

Durland, William R. J.D 2017. The Demise of American Democracy : Understanding the Crisis and Resisting the Threats. USA : CreateSpace Independent Publishing Platform; 2nd edition

Giddens, A. 2009 Sociology. Polity Press. 6th edition.

Hayes, A. et al., 2022. Middle Class : Definition and Characteristics. Retrieved on 8 September 2022. https ://www.investopedia.com/terms/m/middle-class.asp

Herzberg, F. B. et al. 1959, The Motivation to Work.

Hodgkinson, Virginia. 2003. The Civil Society Reader. USA : University Press of New England International.

Irvin, G. 2008. Super Rich : The Rise of Inequality in Britain and The United States. UK : Polity Press.

LaRosa, John 2021. $10.4 Billion Self-Improvement Market Pivots to Virtual Delivery During the Pandemic. August 2, 2021. Retrieved on 8 September 2022. https ://blog.marketresearch.com/10.4-billion-self-improvement-market-pivots-to-virtual-delivery-during-the-pandemic

Lipton, M. 1978. Why Poor People Stay Poor. London : Temple Smith

Luthar, S et. al 2013. 'I can, therefore I must' : Fragility in the upper-middle classes. Dev Psychopathology Nov; 25(4 0 2) : 1529-1549. Retrieved on 8 September 2022. https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4215566/

Marx, K. & Engels, F. 1975. Selected Correspondence. Moscow : Progress Publishers/

Naqvi, S. N. H. 1994. Islam, Economics, and Society. London : Kegan Paul

Ortega, A. 2022. The Depletion of the Middle Class. Retrieved on 8 September 2022. https ://www.realinstitutoelcano.org/en/the-depletion-of-the-middle-class/

Perea,D. R. et al., 2019. The Impact of Non-State Actors (NSAs) on

Civic Space in Bangladesh, Palestinian Territories and Zimbabwe : How Do Resources Influence NGO Resilience? Literature Review. Civicus

Reddy, U Sudhakar 2019. Hyderabad : ED to probe Rs 6,000 crore MLM fraud by two companies. The Times of India. Retrieved on 17 September 2022. http ://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/69779586.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Runciman, W. G. 1990. How Many Classes are There in Contemporary British

Sievers, Bruce R. 2010. Civil Society, Philanthropy, and the Fate of the Commons. USA : University Press of New England.

Taylor, Jon M. 2011. The Case (for and) against Multi-level Marketing-Villains and Victims. Consumer Awareness Institute.

Walker, S. G. 2013. Avoiding the Demise of Democracy : A Cautionary Tale for Teachers and Principals. USA : R&L Education.

ইতিহাস

জলাভাব জলপ্রবাহ জলময়তা

বঙ্গীয় বদ্বীপে জলীয় যাপনের বৃত্তান্ত

স্বাধীন সেন

আমাদের দেশে নদী, বন্যা, চাষাবাদ, পানি ব্যবস্থাপনা ও নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণার সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেসব গবেষণায় নদী, জল ও জলীয় যাপনকে ঐতিহাসিক এবং বিবিধ স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা খুবই গৌণ। বিশেষ করে গত এক দশকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে প্রত্ন-জলবায়ু, নদী ও জলের ইতিহাস, বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে যে বিপুল উপাত্ত-আলোচনা ও তর্ক তৈরি হয়েছে, এই প্রবন্ধে তার কিছু বয়ান দেওয়া হয়েছে। জলীয় যাপনের যে বহুত্বের উদ্‌যাপন ছিল, সেই ঐতিহ্য বর্তমানের চিন্তা ও তৎপরতায় গৌণ। সেই পুরোনো ঐতিহ্যে নদীভাঙন, খরা কিংবা বন্যা 'দুর্যোগ' বা 'অস্বাভাবিক' কিছু নয়। ইতিহাসকে জলের নিরিখে দেখা এবং জলের সঙ্গে মানুষের সার্বিক সম্পর্কের ইতিহাস **স্বাধীন সেনের** প্রবন্ধের বিষয়।

এবার গয়ানাথ সুহাসের দিকে এগিয়ে আসে, 'স্যার, এইখানে আপনাদের মাপামাপিতে কী পাইলেন? নদীখান কি ভাঙিছে? মাপামাপিতে।'

সুহাস বসে-বসেই বলে, 'আপনি যা দেখছেন আমরাও তাই দেখছি। আমরা শুধু এইসব মেপেটেপে এঁকে রাখছি।'

'সেইটাই তো কহিতে চাই স্যার। আটষট্টির ফ্লাডে নদীখান এইঠে আসি গেইছিল, ঢুকি গেইছিল, ঠিকই। কিন্তু তারপর আর ভাঙে নাই। অ্যালায় ফরেস্টখানই ওই দিকে, নদীর দিকে, এর বাদে বাড়ি যাবে।'

'সে যখন যাবে, তখন যাবে, এখন ত আর যাচ্ছে না', বিনোদবাবু তাঁর খাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে বলেন।

'কিন্তুক, স্যার, এই ভরা বর্ষায় তো নদী সবঠেই ঢুকি যাবে। যেখানে যাবে সেইটাই কি বাতিল? স্যালায় তো তামান মৌজা বাতিল হবা ধরিবে...কথাটা আপনি সিধা বলিলেন আমিন বাবু, কিন্তু ঠিকই। জমিনের তো আর পাখনা নাই যে উড়ি যাবে, যেখানকার জমি সেইঠেই

থাকে, সে জমির উপরে জঙ্গলই হোক, আর জলই হোক।'
...সুহাসের সামনে কথা বলছে বলেই এ-রকম ভাবেই বলছে। 'কিন্তু তাতে লাভটা কী আপনার? মানে আপনাদের? আমরা যদি নদীটা এঁকে না-ও নিই, তাহলেও ত নদীটা এখানেই থাকবে।'
'কিন্তু নদী তো এইঠে সরি যাবে স্যার, আর মাস দুই বাদেই নদী সরি যাবে।'
'না, সে তো যাবেই, বর্ষায় নদী যতটা আসে, শীতে ত আর ততটা থাকে না, আপনি শুধু শীতের নদীটাকেই নদী বলবেন নাকি বর্ষার নদীটাও তো নদী, বর্ষার জল যাবে কোথায়?'
সে তো স্যার, যদি আপনি এইটাক নদী বলে ডিক্লার করি দেন, নুটিশ দেন, তার বাদেও তো নদী আরও ছড়ি পড়িবার পারে, বৃষ্টি বেশি হইলেও বাড়িটাড়িত ঢুকিবার পারে, তখন কী কহিবেন, যে-যে-টাড়িত নদীর জল সিন্ধাইছে স্যালায় সব নদীবাড়ি হয়্যা গেইল?'[১]

জল আছে, জল নাই

আমরা এই দেশে জলকাদায় মাখামাখি করে থাকি। আমাদের ভাষাও জলীয়। আমরা বলি, থিকথিকে প্যাক (পচা কাদা), স্যাঁতসেঁতে গরম, সোঁদা মাটি, ঘামে চটচটে শরীর, মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে, থই থই জল, বন্যার মতো মানুষের মিছিল, তুফানের মতো হামলা, ঝড়বাদলার রাত, ঠাটা পড়া রোদ, বৃষ্টির মতো গুলি করা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের এমন নানান অভিব্যক্তিও প্রবলভাবে জলজ। কোনো না কোনোভাবে আমাদের শরীর, মন, ভাষায় (কায়োমনোবাক্যে) জলের বিভিন্ন রূপ-রস-দশা মাখামাখি হয়ে আছে। ওপরের উদ্ধৃতিতে আধুনিক ও ব্যক্তিসম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ করতে আসা জরিপকারী আমিনের সঙ্গে গয়ানাথের তর্কে নজর দেওয়া যাক। পরিশেষে এই তর্ক মানুষের জীবনযাপনে নদী আর জমিনের অবিচ্ছেদ্যতাবিষয়ক। সেই যাপনে বিচ্ছেদ ঘটানো আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনার বাস্তবিক ও আইনি সংকট এই তর্কে স্পষ্ট। নদীর এক পাড় ভেঙে আরেক পাড়ে গড়ে ওঠা চরের মালিকানা কার? শত শত বছর ধরে কোনো দলিল আর খতিয়ানের বরাত ছাড়াই সকলে মিলে ব্যবহার করতে থাকা জলাভূমির স্বত্বাধিকার কার? নদীর মালিক কে? রাষ্ট্র? সমাজ? সম্প্রদায়? ব্যক্তি? নদী যদি ব্যক্তির জমি ভেঙে জায়গা করে নেয়, তখন যে জায়গায় জমি ছিল সেই জায়গার নদী কার হবে? যে দাগ টেনে ভূমি খতিয়ান আর অন্য মানচিত্র রাষ্ট্র-মানুষ এঁকেছে, স্বীকৃত দলিল হিসেবে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কীভাবে নির্ধারিত হবে? শীতে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় যদি জল ও জমির সীমানা বদলে যায়, তবে সে ব্যাপারে মানচিত্র ও মালিকানার বিধান কী? গয়ানাথীয় এই যুক্তিতক্ক আমাদের জীবনে স্বাভাবিক বলে ধরে-নেওয়া আধুনিক, ব্যক্তিসম্পত্তিনির্ভর আর উন্নয়নকামী যাপনের জন্য ভীষণ অস্বস্তিকর। তবে এই অস্বস্তি অবৈধ কিংবা অন্যায্য নয়।

জানি না, 'ক্লাইমেট' শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'জলবায়ু' শব্দটির ব্যবহার প্রথম কে করেছিলেন![*] যিনি করেছিলেন, তিনি হয়তো ক্রিয়াগত একটি সংজ্ঞার কথা ভেবেছিলেন। তবে এই জলবায়ু শব্দটির ব্যঞ্জনা ভিন্নও হতে পারে। পৃথিবীর যে জলচক্র, তাতে স্থলভাগ আর জলভাগের ওপরে অন্তরিক্ষের মেঘ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টি। বাতাসে মিশে থাকে আর্দ্রতা। অন্যভাবে বললে, জলীয় ভাবটিকে কেবল তরল বা বায়বীয় বা কঠিন পদার্থগত দশার মতো আলাদা আলাদা করা যায় না। নদী, বৃষ্টি, বরফ, মেঘ, ভূগর্ভস্থ পানি—প্রতিটিই আবার একটি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মুহূর্তও বটে। যেমন বলেছেন দিলীপ দা কুনহা, 'প্রতিষ্ঠিত ধারণায় বৃষ্টি বা মেঘ যেন মেহমান। আর নদী হলো গৃহস্থ।'[২] তিনি বলেন, কেবল নদীর মুহূর্তে বসবাস করার মানে হলো নদীর একটানাভাবে গতিশীল ও ধারাবাহিক চলনে ছেদ ঘটানো। জমির জল বায়ুবাহিত হয়ে অন্তরিক্ষে মেঘ তৈরি করে। সেই মেঘই আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে। বয়ে যায় নদীতে বা খালেবিলে। পরিশেষে সমুদ্রে। সঙ্গে বহন করে আনে সেই মাটি বা পলল। পলল জমা হয়ে সৃষ্টি করে নতুন জমিন। স্থল, জল আর অন্তরিক্ষের এই মাখামাখি সম্পর্ককে আমরা নানান আধুনিক বিজ্ঞান ও শাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা করি। গবেষণা করি। নীতি নির্ধারণ করি।

অথচ বাংলাদেশ সর্বত্র জলীয়। বছরের সকল সময়। যে জলময়তাকে বন্যা বলি, তা জলের সঙ্গে জমিনের মানুষের তৈরি করা গণ্ডি ভেঙে ফেলে। আবার খরা হলেও জলাভাবেই ঘটে। বৃষ্টি পড়ে না। জমির নিচের জল, জমিতে মিশে থাকা জল শুকিয়ে যায়। তার মানে শুষ্কতা বা আর্দ্রতা পরিশেষে জলীয়তারই ভিন্ন ভিন্ন দশা ও মুহূর্তমাত্র এবং তা স্থানিক ও কালিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জীবন ও যাপন আবশ্যই জলীয়। মানুষের সঙ্গে থাকা না-মানুষী জগতের জীবনও জলীয়। আধুনিক ইতিহাস, প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান আর সাহিত্যেও আমরা সিক্ততা আর শুষ্কতাকে আলাদা করি। ভিন্ন ভিন্ন খোপে বদ্ধ করার এই বোঝাপড়া আমাদের বৃষ্টি, জমি, নদী ও মেঘের সঙ্গে মাখামাখি করে থাকা যাপনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও সংবেদনের সঙ্গে বেমানান। আমাদের মতো যারা মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতনির্মিত-নিয়ন্ত্রিত-পুনর্গঠিত বদ্বীপ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস ও জলীয় যাপন করছি, তাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন দশাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্নভাবে বুঝতে চায়। বদ্বীপের যাপনের মধ্যে যে ক্ষণস্থায়িত্ব

[*]অতীতে জলবায়ু শব্দজুটির জায়গায় 'আবহাওয়া' শব্দজুটির চল ছিল।—**সম্পাদক**

ও স্থায়িত্বের অবিরাম পরিবর্তনের ধারা, তাকে অনড় ও স্থবির বলে গণ্য করে।

তিন শ বছর ধরে নদী ও জলকেন্দ্রিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা এই আজব বিভক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতহীন স্থবিরতাকে সর্ববিস্তারী ও কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে।

আমি স্পষ্টভাবেই মনে করি, বঙ্গীয় বদ্বীপে বিবিধ দশার মধ্যে একটানা পরিবর্তিত হতে থাকার এই আধুনিক এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রতিষ্ঠিত প্রবল ধারণার প্রতি অনুগত বেশির ভাগের কাছেই এই বিবেচনা নিতান্তই তত্ত্বকথা। কিন্তু পশ্চিম ও উপনিবেশ দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত অঞ্চলের রূপান্তরের ইতিহাস জানা-বোঝা ছাড়া সংকটের মোকাবিলা করা অসম্ভব। পাশাপাশি প্রাক্-ঔপনিবেশিক জলীয় যাপনের বহুত্ব কথা জল-জমিন-জীবনের অবিচ্ছেদ্যতাকে স্বাভাবিক ধরে নেওয়ার ইতিহাস জানাও অত্যন্ত দরকার। তবে ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেই এই জানাশোনার প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ করা যাবে না; বরং যাপনের দীর্ঘ স্থানিক ও কালিক অভিজ্ঞতায় প্রকৃতি ও মানুষের বহু রকমের যৌথতা ও যুক্ততার উপলব্ধি ও সংবেদন আবাদ করাও এই ইতিহাস জানার অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে। এই লেখায় আমি জলাভাব ও জলময়তার এই দুই দশার ইতিহাসের দিকেই কিছু উদাহরণসহ ইশারা করতে চাই। দশা বদলের প্রক্রিয়া নিয়েও কয়েকটি পর্যবেক্ষণ পেশ করব। তবে জলীয় যাপনের আশীর্বাদ ও অভিশাপ নিয়ে উপযোগবাদী আলোচনা এটা হবে না।

শুকনো গাঙে জীবনের বান

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যা হয়ে গেল এ বছর। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পানি বহু নদীনালা আর জমির ওপর নিয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে আসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। পানি নেমে আসার পথে মানব বসতায়নের ফলে নানা রূপান্তরের কারণে বন্যা মানুষের জীবনে দুর্দশা তৈরি করছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও বন্যার কারণে মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট হয়েছে, মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রাণ হারিয়েছে। নদী-নালার খাতে যখনই ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি পানি চলে আসে এবং সেই পানি নিষ্কাশিত হওয়ার গতি ও হার বিভিন্ন কারণে কমে যায়, তখনই নদীনালা কূল ছাপিয়ে আশপাশের জমিকে জলমগ্ন করে। জল ও বন্যা নিয়ে অধ্যয়ন চালানো বিভিন্ন আধুনিক শাস্ত্রে (যেমন পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) জলমগ্নতার মাত্রা ও সময় বিবেচনা করে কোনো জলমগ্নতাকে জলাবদ্ধতা বলা

হয়, আবার কোনো জলমগ্নতাকে বন্যা বা প্লাবন বলা হয়। স্বাভাবিকভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ এবং বদ্বীপের উত্তরের হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশীয় অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এমনই যে অতীতেও জলনিষ্কাশনে সক্ষম নদী এবং সংলগ্ন জলাভূমি নির্দিষ্ট একটা সময়ে ভরে গিয়ে জমিকে জলমগ্ন করত। শীতকালে নদীর খাতে পানিপ্রবাহ কম থাকে। তখন খাতের জমি ও চর উন্মুক্ত হয়। চাষাবাদসহ নানা কাজে তা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নদীখাতের প্রস্থ ও গভীরতা অনুসারে একেক ঋতুতে জমি ও জলের সীমানা বদলে যেতে থাকে। এই বদ্বীপে নদীর কূল ছাপিয়ে আশপাশের জমিকে জলমগ্ন করা স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। হাজার হাজার বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চলমান। অন্যভাবে ভাবলে, জল ও জমিনের যে ফারাক আমরা আধুনিক চিন্তায় করি, সেই ফারাক আসলে সব সময়ই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ছিল। বদ্বীপের অগণিত নদী-জলাভূমি-বৃষ্টিপাত মিলে যে বাস্তুতন্ত্র, তা জলনির্ভর। ক্ষয়-পরিবহন-সঞ্চয় এবং পুনরায় ক্ষয়ের চক্রাকার জলীয় প্রক্রিয়াই এই বদ্বীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলের জীবনের বাস্তবতা।

এ বছরেই বন্যার পরেই দেখা গেল জলাভাব। দিনাজপুরসহ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এই মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ায় সাময়িক খরাও দেখা গেল। কৃষকেরা চাষাবাদ করতে পারছিলেন না। এমনকি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আরও নিচে নেমে যাওয়ায় গভীর নলকূপের সেচ দিয়েও জমি আবাদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রচণ্ড গরমে নাভিশ্বাস উঠেছিল। জীবজগতও এই গরম ও খরা (অথবা জলাভাব) থেকে রেহাই পায়নি। তাহলে জল থাকা অথবা না থাকা—দুটিই বাংলা অঞ্চলে আমাদের জীবনযাপনের অন্যতম কেন্দ্রীয় শর্ত। আধুনিক শাস্ত্র অনুসারে জলকে জড় পদার্থ বিবেচনা করে নদী বা জলাশয়কে প্রাণহীন ও নিষ্ক্রিয় ধরে নিলেও মানুষসহ প্রাণীর দুনিয়ার সঙ্গে এই জড়জগতের মিথস্ক্রিয়াই যে আমাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত, তা ঢাকা পড়ে না। বেঁচে থাকার পরের অন্যান্য কাজ, উন্নয়ন-প্রগতি-উৎপাদনের কথা না হয় বাদই দিলাম আপাতত। অথচ এই বদ্বীপের প্রাক্-ঔপনিবেশিক চিন্তা ও চর্চার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, স্থানীয় বিভিন্ন ঐতিহ্যে জল বা নদী বা বৃষ্টিকে জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করার বিশ্ববীক্ষা বহাল ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কালে না-মানুষী (Non-human) বিভিন্ন কুশীলবকে সক্রিয় সত্তা হিসেবে ভাবার ঐতিহ্যগুলোকে সমরূপ করে ফেলা হলো। আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নয়নের ধারণা যে ধরনের মানবায়ন বিশ্বজনীন করে

তুলল, সেখানে সকলই নিষ্ক্রিয় ও ভোগযোগ্য হয়ে উঠল। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এমন বিভাজন সৃষ্টিকারী শাস্ত্রচর্চাই এখন প্রবল ও হেজিমোনিক। বাংলাদেশ (তথা অবিভক্ত বাংলা) অঞ্চল এবং সংলগ্ন বিভিন্ন পরিসরে জল ও জমির যুক্ততাকে আমরা নিছকই প্রায়োগিক, উপযোগিতাবাদী ও মানবায়িত জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝি। ধরে নিই মানুষের (বা আমাদের) কর্তাসত্তাই কেন্দ্রীয় ও একমাত্র সক্রিয় চরিত্র। মানুষই জল ও জমিকে ব্যবহার করে। সাফল্য, দক্ষতা ও উন্নতির জন্য মানুষ জল-জমিকে যতটা ব্যবহার করতে সক্ষম, ততই তাদের সভ্য, উন্নত ও সফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

হালের জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ বাস্তবতায় ওপরের প্রসঙ্গগুলো চিন্তকদের মধ্যে আবারও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সাম্প্রতিক বিভিন্ন আলাপে প্রাক্-ঔপনিবেশিক চিন্তা ও চর্চাগত বিভিন্ন দিক আলোচিত হচ্ছে।[৩] কিন্তু এই আলোচনায় বঙ্গীয় বদ্বীপের পরিপ্রেক্ষিত খুব বেশি আসে না। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি আর সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ায় সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে থাকা বাংলাদেশে এই ইতিহাস ও অতীত প্রায় অনুপস্থিত, বিস্মৃত ও অপ্রাসঙ্গিক। জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব মোকাবিলার পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগ চলছে। চলছে তর্কবিতর্ক। এসবের মধ্যেও এই বদ্বীপের জড় ও জীবজগতের মাখামাখি করে থাকার ইতিহাসের আলাপ বিরল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও পদ্ধতি ও কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই মুখ্য। গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে মানুষি ও না-মানুষি কুশীলবগুলোর বিজড়িত থাকার ঐতিহ্য বোঝার লক্ষণ বেশি নেই। বরং মানুষ ও পানির মধ্যে বিরাজমান বিচ্ছেদকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে মানুষ কীভাবে টিকে থাকতে পারবে, তার পথ খুঁজে বের করা আর লাগসই উন্নয়নের ধারণাকে জোরেশোরে প্রচার করা এক নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের লক্ষ্য তাহলে কী? আমাদের আজকের আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবল বয়ানগুলোর সীমাবদ্ধতার দিকেও কিছু ইঙ্গিত করা হবে।

বদ্বীপের বিভিন্ন স্থানের জল ও জমির সম্পর্কের বহুরূপিতাকে আমলে না নিয়ে কীভাবে প্রকৃতি-জমি-জলকে সম্পত্তিতে রূপান্তর করা যায়, রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত করা যায়, বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সম্পদে পরিবর্তন করা যায়; এই অঞ্চলে সেই তৎপরতার আরম্ভ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল থেকে। তবে মানুষ (বা সংস্কৃতি) ও প্রকৃতিকে দ্বিভাজিত, আলাদা এবং সম্পর্কিত

বর্গ ও সত্তা হিসেবে বিবেচনা করার সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের আলোকময়তার (Enlightenment) চিন্তার হাত ধরে। এ ধরনের চিন্তাপ্রসূত বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার সঙ্গে বাদবাকি দুনিয়ার ওপরে পশ্চিম ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ, দখল আর সাম্রাজ্য বিস্তার ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পশ্চিমা দুনিয়ার 'বিখ্যাত' সব অভিযান আর আবিষ্কারের ইতিহাস ওল্টালে দেখা যাবে, দখলের বৃত্তান্ত। আধুনিকতা ও সভ্যতার ধারণার প্রধান পাটাতনই হলো প্রকৃতির ওপরে মানুষের দখলদারি ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার বাসনা। আধুনিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃতির 'রহস্য' উন্মোচন করার দাবি করে। আবিষ্কার করে বিভিন্ন সাধারণীকৃত নিয়ম ও সূত্র। সেই সূত্রানুসারে মানুষ প্রকৃতিকে তার নিজের প্রয়োজন, বিকাশ ও প্রগতির জন্য উদ্ভাবন করবে নিত্যনতুন প্রযুক্তি। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই কাহিনি আমরা আত্মস্থ করেছি। স্বাভাবিক বলে মনে করা শিখেছি।

প্রকৃতির ওপরে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও শাসন করার এই ইতিহাসের আরেকটি বড় ঘটনা হলো, শিল্পবিপ্লব এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। কয়লা-তেলসহ নানা ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি গত ৩০০ বছরে আমাদের সভ্য-উন্নত-উৎকৃষ্ট জীবনের মানদণ্ড ও চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। দুনিয়ায় নানামুখী প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও জীবনহানিও ঘটে চলেছে জীবাশ্ম জ্বালানিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (খনিজ ও জৈবিক) দখল, বেচাকেনা আর ভোগ করার জীবনযাপন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানকে দরকার মতন দখল ও ব্যবহার করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বাড়তে থাকা ব্যবহার পৃথিবী নামের গ্রহটির ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এই যুগকে তাঁরা নাম দিয়েছেন 'অ্যানথ্রোপোসিন'।[৪]

ওপরের আলোচনার আলোকে ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে এই অঞ্চলে চলমান নদী ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় তৎপরতাকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি। প্রতিবছর উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানির তোড় ও জোয়ার-ভাটার কারণে তৈরি করা পোল্ডার ও বাঁধ ভাঙে। সেই বাঁধ আবার কোটি টাকা খরচ করে মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করা হয়। যে স্থানে বন্যা বা জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে, সেই স্থানে বন্যা-জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রকল্প। অন্যদিকে সংলগ্ন এলাকায় জলমগ্নতা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে গত শতকের আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানের (ফ্যাপ) কথা বলতেই হবে। দীর্ঘ সময়

ধরে বৈদেশিক সাহায্য এবং নানা দেশের বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। নেদারল্যান্ডসসহ পশ্চিমের নানা দেশের পানি বিশেষজ্ঞ, পানি ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদসহ বহু শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় কিংবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জল ও জমির সম্পর্কের বিভিন্ন দশা ও প্রভাব নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। বিপুল বিনিয়োগে পরিকল্পনা ও গবেষণা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরেও বন্যা ও খরার সমস্যার কোনো নিদান মেলেনি। অর্থাৎ বড় গলদ রয়েছে। এই গলদ কোথায়? পরিকল্পনায়? ব্যবস্থাপনায়? বিনিয়োগে দুর্নীতি আর স্বল্পমেয়াদি ভাবনাচিন্তায়?

হয়তো ওপরে বলা সব কটি গলদই বিরাজমান।

বঙ্গীয় বদ্বীপে বন্যার স্থানিক ব্যাপ্তি, চলন আর রূপান্তর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুভব করতে গেলে একদিকে যেমন উত্তরের হিমালয় পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তীয় অংশ আর সংলগ্ন পাদদেশীয় অঞ্চল বিবেচনায় নিতে হবে, তেমনি উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত বাংলাদেশের পূর্ব পাশের হিমালয়ের সংযুক্ত পর্বতমালাকেও হিসাবে ধরতে হবে। অন্যদিকে পশ্চিমের ছোট নাগপুর মালভূমি, গঙ্গা নদীর উত্তরাংশের নেপালসংলগ্ন সমভূমি আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকে এই পরিসরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ধরতে হবে। তাই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা বদ্বীপে বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূখণ্ড আর ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহারের অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট দাগ টেনে এই বদ্বীপের বন্যার (আর নদী, বৃষ্টি, জল ও জীবনের) নিবিড় ও সম্পর্কজাত বোঝাপড়া তৈরি সম্ভব না।

সিক্ততা আর শুষ্কতার ভেদরেখা

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের তথাকথিত আমেরিকা আবিষ্কারের সালকে যদি মোটাদাগে নতুন এক ইতিহাসের শুরুর বিন্দু হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে পরের বিন্দুগুলো হলো পশ্চিম ইউরোপের দুনিয়াব্যাপী দখলদারিত্বের একেকটি অধ্যায় বা যুগ। এই দখল, হত্যা এবং শাসনের অধীনে যেমন ক্রমে ক্রমে অপশ্চিমের মানুষ ও সমাজগুলোকে নিয়ে আসা হলো, তেমনি না-মানুষি দুনিয়াকেও শাসন, ব্যবহার আর রূপান্তরিত করার আখ্যানও রচিত হলো। দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন সংস্কৃতির যাপনে বিভিন্নভাবে, রূপকে ও বৃত্তান্তে জল, স্থল, অন্তরিক্ষের যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাকে ভেঙে রচিত হলো ভেদাভেদ আর বিচ্ছেদের আধুনিক আখ্যান।

অনেক চিন্তকই জল, স্থল, অন্তরিক্ষ সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া আর মানচিত্রায়ণের ইতিহাস ও ধরন নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রস্তাব করেছেন।[৫] দিলীপ দা কুনহা যেমন বলার চেষ্টা করেছেন নদী আবিষ্কারের কাহিনি। মানচিত্র আঁকার সময় দাগ টেনে নদীকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি দাগের দুই পাশের স্থানকে জমি বা ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করি। এই দাগ দিয়ে জলময় ও জলহীন নামে দুটি আলাদা অবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়। দাগটি সেই ভেদাভেদের একটি রূপক মাত্র। কুনহা বলেন, 'মানচিত্রে একটি দাগ টেনে আমরা নদী বা জলধারাকে চিহ্নিত করি। সেই দাগটিকেই স্থির ও অপরিবর্তনীয় ধরে নিই। যেমন উপকূলে সেই দাগের এক পাশে স্থল আর আরেক পাশে জল বুঝে নিই। কিন্তু আমাদের আঁকা এই দাগ যেমন বছরের বিভিন্ন সময়ে বদলে যেতে থাকে, তেমনই এই স্থলে মানুষের যাপন ওই দাগকে অস্বীকার করে চলতে থাকত।'[৬] যদিও আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র, বহুজাতিক পরিকল্পনা আর বিজ্ঞান মানুষ ও না-মানুষ সব কুশীলবকেই এই দাগ মান্য করে চলতে বাধ্য করে। কিন্তু প্রকৃতি ও তার প্রক্রিয়া আমাদের টানা এই দাগ বারংবার অস্বীকার করে। দা কুনহার পাশাপাশি আরও অনেক চিন্তক এবং প্রতিবেশ ও পরিবেশের ইতিহাসবিদেরা প্রকৃতি ও নদীকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও রূপান্তর করার আধুনিক বিভিন্ন তরিকা নিয়ে আলাপ করেছেন।[৭] দুনিয়ার বিরাজমান বহুত্বকে বিলুপ্ত করে একমাত্রিক, একরৈখিক এবং একমাত্র যাপন হিসেবে আমরা এখন এই মানদণ্ড ও পরামর্শকে নিজেদের জন্য দরকারি ও জরুরি হিসেবে মান্য করতে শিখেছি। সম্মতি দিয়েছি। একটি বড় কারণের কথা আগেই বলা হয়েছে যে, বোধ হয় আমাদের ইতিহাসচর্চা আর ইতিহাসচেতনায় প্রতিবেশ, পরিসর আর সময়কে উপলব্ধি করার ধারাবাহিক অবজ্ঞা স্থায়ী হয়ে গেছে। পাশাপাশি এমনভাবে ইতিহাস রচনা করা চলছে যে ইতিহাস কেবল মানবায়িত দুনিয়ার অতীতই বলবে।

তবে অ্যানথ্রোপোসিনের কালেই কি জলবায়ু বা পরিবেশের অথবা নদী-জলের সম্পর্কের বদল ঘটেছে? প্রাক্-ঔপনিবেশিককালে মানুষের অন্তত ৩০ লাখ বছরের ইতিহাসে প্রতিবেশ বা পরিবেশের পরিবর্তন কি ঘটেনি? প্রকৃতি বা নদী বা জলের ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রচেষ্টা কি এই অঞ্চলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়ে ছিল না? জলবায়ু পরিবর্তন আর সেই পরিবর্তনের প্রভাব কি আগে ছিল না? বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড় কি মানুষসহ অন্যান্য জীবনকে ধ্বংস ও রূপান্তরিত করেনি?

জলীয় যাপনের বহুত্ব বনাম মানচিত্রায়ণ, সমীক্ষা ও মুনাফার শাসন

আমাদের বিজ্ঞান ও গবেষণা যেভাবে নদী, জল ও বন্যাকে ব্যাখ্যা করে, বুঝবার আর শাসনের চেষ্টা করে, সেই তরিকাগুলো কিন্তু প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য অবিচ্ছেদ্য ছিল না। বরং এই তরিকাগুলোকে অনিবার্য, আবশ্যকীয় এবং স্বাভাবিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর বাইরে অন্য বা ভিন্ন ধরনের মিথস্ক্রিয়ার সূত্র পাওয়া যায় যে ইতিহাসে, সেই বৃত্তান্ত জানার দুরূহ কাজও কিছু হয়েছে। জল-স্থল-অন্তরিক্ষকে দখল করে ক্রমাগত মানুষের উন্নতির নামে, মানুষের সামর্থ্যের মানদণ্ড হিসেবে বদলে দেওয়া হয়েছে। এই বদলানোকে ইতিহাসবিদেরা বলছেন 'টেরাফরমিং'। গ্রহসংক্রান্ত বিজ্ঞানে অন্তরিক্ষের কোনো গ্রহকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে রূপান্তর করাকে 'টেরাফরমিং' নামে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু পৃথিবী নামের মানুষের বসবাসযোগ্য এই গ্রহটিতে জীব-জড়, মানুষ ও না-মানুষি জগতের অবস্থা ও তাদের ভেতরকার সম্পর্ককে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, বহুজাতিক পুঁজি আর সভ্যকরণ কিংবা সভ্য হয়ে ওঠার বাসনার চাপে যেভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে, সেই বদলানোকেও ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা এখন 'টেরাফরমিং' নামেই আখ্যায়িত করছেন। এই টেরাফরমিংয়ের ভয়াবহ প্রভাব ও ফলাফলই এই গ্রহের বর্তমান মারাত্মক ও জীবনবিনাশী দশার প্রধান কারণ। মানুষই এখানে একমাত্র কুশীলব। টেরাফরমিং আর অ্যানথ্রোপোসিনের অন্যতম প্রধান নমুনা হলো জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার বিকাশ ও বাস্তবায়ন। সসীম সম্পদময় একটি গ্রহে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে অসীম বলে ধরে নেওয়ার কারণে অ্যানথ্রোপোসিনকে অনেকে ক্যাপিটালোসিন নামেও ডাকেন। অনন্ত মুনাফাকামী পুঁজির সক্রিয়তা দিয়ে এটি বোঝা যায়।

ভোগ ও উন্নয়নের যুক্তিতে নদীশাসন আর বন্যা ও জল ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন প্রযুক্তি ও চিন্তা ১৯৫০-এর দশকের পর থেকে সর্ববিস্তারী হয়ে উঠলেও তারও আগে দুনিয়ার নানা প্রান্তেই বিভিন্ন পদক্ষেপে জল নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা অঞ্চলে পরিচালিত নদীপথের বিভিন্ন জরিপের প্রতিবেদন তার সাক্ষ্য দেয়। পৃথিবীর প্রথম করপোরেট কোম্পানি হিসেবে ভারত উপমহাদেশের ওপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার নদী-জলাভূমির জরিপ যেমন শুরু হয়, তেমনি শুরু হয় মানচিত্রায়ণের কাজ। এসব সমীক্ষা বিচ্ছিন্ন কোনো উদ্যোগ ছিল না। এই কালকে সমীক্ষার কাল হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি অঞ্চল সম্পর্কে বিভিন্ন মাত্রিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

ও নথিভুক্ত করে একের পরে এক যেসব ঔপনিবেশিক জ্ঞান উৎপাদনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, তার একটি রূপ হলো জ্ঞান ও ক্ষমতার মানিকজোড় সম্পর্ক। জ্ঞান যেমন ক্ষমতাকে বিস্তৃত করতে তথা নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, দণ্ডবিধি, রাজস্ব ও বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে ভূমিকা রেখেছিল, তেমনি ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হওয়া শাসনপ্রণালির সুবাদে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছিল। নদী সমীক্ষা, নৌপথে যোগাযোগের সমীক্ষা, জনশুমারি, প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা, কর-রাজস্ব আদায়ের রীতি ও আইনের সমীক্ষা, ভূমি জরিপ, উদ্ভিদের সমীক্ষা, আবাদের পদ্ধতি ও শস্যের সমীক্ষাসহ বিচিত্র বিষয়ে সমীক্ষা হয়েছে। অগণিত নথি ও প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ভারতে জরিপের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিগণিত মেজর জেমস রেনেলের সমীক্ষাসহ আরও নানা সমীক্ষা নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। প্রথম দিকের বেশির ভাগ জরিপকারীই ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য। নদী-জলপথের ধরন ও নেটওয়ার্ক জানা, নদীর প্রবাহ সম্পর্কে জানা, নদীর নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকা হাট-বাজার-বন্দরগুলো সম্পর্কে জানাসহ নানা উদ্দেশ্যে এসব জরিপ হয়েছে। নদী ও সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল জরিপ করার জন্য আলাদা বিশেষায়িত শাখা চালু হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জরিপ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও শাস্ত্রীয় রূপরেখা (Disciplin) তৈরি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে মানচিত্র অঙ্কন শুরু হয়েছে। এই তৎপরতা ঊনবিংশ শতকে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখানে তৎকালীন হুগলী-ভাগীরথী নদী ও মোহনা অঞ্চল নিয়ে পরিচালিত জরিপগুলো উদাহরণ হতে পারে। একদিকে কোম্পানি ও ব্রিটিশ উপনিবেশের রাজধানী হিসেবে কলকাতা নগরীর পত্তন ও প্রসার ঘটানোর জন্য কলকাতার জলাভূমিগুলোকে নগর তৈরির উপযোগী হিসেবে রূপান্তর করা যেমন জরুরি ছিল, অন্যদিকে কলকাতা হয়ে যে বিশাল বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল, সেই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক বহাল রাখার জন্যও হুগলী-ভাগীরথী নদীর নাব্যতা বজায় রাখা, পলির ব্যবস্থাপনা ও ভাঙন মোকাবিলা করার দরকার ছিল। ব্রিটিশরাসহ পশ্চিমারা বাংলা বদ্বীপের দক্ষিণাংশের নদীবাহিত পলিকে সোনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আবার, বিশেষ করে হুগলী-ভাগীরথী নদীর বহন করে আনা জলীয় পলি নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য সমস্যা বলেও চিহ্নিত হয়েছিল। স্মরণে রাখা দরকার যে এই হুগলী নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল সেকালের ঔপনিবেশিক নগরগুলো : ব্রিটিশদের কলকাতা, ডাচদের শ্রীরামপুর, ডাচ বা ওলন্দাজদের চিনসুরা বা চুঁচুড়া, ফরাসিদের চন্দননগর আর পর্তুগিজদের ব্যান্ডেল। বাংলাদেশের নানান অঞ্চলের যোগাযোগ নৌপথনির্ভর হওয়ায়

অভ্যন্তরীণ নৌপথের মানচিত্রায়ণ, বৈশিষ্ট্য নিরূপণ আর নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার হয়ে পড়ে ছিল।[৮]

এখানে আমরা মোগল আমলে বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠা ঢাকার উল্লেখ করতে পারি। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে রাজধানী হিসেবে ঢাকার পত্তন নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে। আদি-ঐতিহাসিক সময় থেকেই এই বদ্বীপে বসতি ও নগর পত্তনের বেলায় প্রধান প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে নদীপথ। মোগল ঢাকার বিস্তৃতি ব্রিটিশ কলিকাতার তুলনায় কম হলেও নদী ও খালের গুরুত্ব ব্রিটিশ আমলের ঢাকাতেও বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। মোগল আমলে নদীপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও প্রতিরক্ষার জন্য যে দুর্গগুলো ঢাকা ও সংলগ্ন নারায়ণগঞ্জে নির্মিত হয়েছিল (যেমন সোনাকান্দা, ইদ্রাকপুর, হাজীগঞ্জ দুর্গ) সেই দুর্গগুলো প্রধানত এই জলীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু কলকাতা নগরের পত্তন ও প্রসারের জন্য জল ও জমিনের যেমন রূপান্তর করা হয়েছিল, যেভাবে সেই রূপান্তরের প্রয়োজনে নতুন নতুন জ্ঞান ও শাস্ত্র তৈরি করা করেছিল, আর যেভাবে সেই জ্ঞান ও শাস্ত্র ধীরে ধীরে এই বদ্বীপের জলীয় জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল, তেমন কোনো উদাহরণ মোগল নগর ঢাকার পত্তন ও বিকাশের বেলায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মোগল ঢাকার জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো বিশদ গবেষণা হয়নি বললেই চলে। ঢাকার বিকাশের সঙ্গে জল-জমিনের সম্পর্কের বদল কী মাত্রায় ঘটেছিল, সেই গবেষণাও আমাদের দেশে হয়নি। তবে প্রাথমিক বোঝাপড়ায় অনুমান করা অসংগত হবে না যে কলকাতাসহ অন্যান্য নগর, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্রের পত্তন ও প্রসারের মাধ্যমে যেভাবে জমির প্রকৃতি পুরো পাল্টে দেওয়া হয়েছিল, যেভাবে নদীর প্রকৃতি পাল্টে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার পৌনঃপুনিক চেষ্টা করা হয়েছিল, মোগল ঢাকার বেলায় সেটা ঘটেনি। আর আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার খোপে খোপে বিন্যস্ত জ্ঞান দিয়ে মানচিত্রায়ণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির বিকাশও মোগল আমলে ঘটেনি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক জল ব্যবস্থাপনা আর ঔপনিবেশিক জল ব্যবস্থাপনার ফারাক, পরিশেষে, চিন্তা ও ধারণাগত। প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে শাসন, নিয়ন্ত্রণ, দখল ও সম্পদ আহরণের অনন্ত প্রকল্প বিশ্বজুড়ে একইভাবে হাজির থাকার কোনো আলামত এখনো ইতিহাসবিদগণ চিহ্নিত করেননি। বন্যা, নদীভাঙন ও জলমগ্নতা মোগল আমল বা তার আগের আমলেও স্বাভাবিক ছিল। তা বর্তমান ঢাকার স্থানেই হোক কিংবা বদ্বীপের অন্যত্রও হোক। যে সংবেদন, অভিজ্ঞতা ও তৎপরতা দিয়ে সেই সময়ে জল

এবং জমির বহুত্ব বজায় ছিল, সেই যাপন আর উপনিবেশে থাকল না।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ও দ্বিতীয় দশকে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন ও পরে বুকাননের পথ ধরে মন্টোগোমারি মার্টিন তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় সামগ্রিক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ভূপ্রকৃতি, নদী, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মাটির ধরন, চাষাবাদ, শস্য, ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র উপাত্ত তাঁরা নথিভুক্ত করেন। সেই সময়ে উপর্যুক্ত অঞ্চলের এই বিষয়াবলি সম্পর্কে জানার জন্য তাঁদের এই জরিপের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এখানকার নদী ও পুকুর-দিঘি প্রসঙ্গে উপাত্ত নথিভুক্ত করতে গিয়ে বুকাননের ও মার্টিনের সমস্যা হয়েছিল। তারা বলছেন যে একই নদীর প্রবাহ একেক স্থানের মানুষের কাছে একেক নামে পরিচিত। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ পরিচিত একই নামে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণ অনুসারে এমন নামকরণ অগ্রহণযোগ্য। দুজনেই এই নামকরণ ও নদীপ্রবাহের স্থানীয় উপলব্ধি নিয়ে সংশয় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। দিনাজপুর অঞ্চলের অসংখ্য পুকুর ও জলাশয়কে বুকানন পরিত্যক্ত অবস্থায় পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পান। এসব পুকুরের অপ্রয়োজনীয়তা আর বাহুল্যের কথাও বুকানন উল্লেখ করেছেন। এখানকার জীবনযাপনে নদীর নামকরণের ভিন্ন প্রকরণকে কেবল ক্রিয়াগত হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে বুকানন পশ্চিমের ও আধুনিক সমীক্ষাবাদী ধারণার ব্যবহার করতে গিয়েই সংকটে পড়েছেন।[৯]

এই বদ্বীপে নদীর নাম কেবল পরিচয়বাচক না। নদীর যেমন লিঙ্গবিভাজন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সক্রিয় সত্তা। প্রতিটি নদীপারের মানুষেরা ওই নদীকে নানা নামে আখ্যায়িত করে ওই সব নদীর গুণাবলি ও কথ্য ইতিহাস বয়ান করেন। যেমন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রন্থবদ্ধ *করতোয়া-মাহাত্ম্য* নামের স্থল-পুরাণে পুণ্ড্রনগরের পাশে প্রবাহিত করতোয়া নদীর নানা গুণের আখ্যান পাওয়া যায়।[১০]

বুকাননের পক্ষে নদী ও যাপনের এই ঐতিহাসিক যুক্ততাকে আমলে নেওয়া সম্ভব ছিল না। একইভাবে এই অঞ্চলে কৃত্রিম জলাশয়ের প্রকৃতি ও পরিচয় বুঝতেও তিনি সমস্যায় পড়েছেন। বৃষ্টির পানি সঞ্চয় করে শুকনা মৌসুমে চাষাবাদসহ নানা কাজে ব্যবহার করার ঐতিহ্য বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রাক্-ঔপনিবেশিক জল ব্যবস্থাপনার আবশ্যকীয় প্রকরণ ছিল। অন্ততপক্ষে সাধারণ* সপ্তম-অষ্টমশতক থেকে ১৭০০-১৮০০ শতক অবধি পুকুরের এই গুরুত্ব অটুট ছিল। বিভিন্ন টেক্সট আর অভিলেখেও দান করা জমির সীমানা হিসেবে, গ্রামের সীমানা হিসেবে এবং দানের অংশ হিসেবে পুকুরের (পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা)

কথা উল্লিখিত হয়েছে। শাসক, সামন্ত এবং সম্পন্ন কৃষকদের পাশাপাশি সামাজিকভাবেও পুকুর খোঁড়া পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতো। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতমে* পাল শাসক রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র অঞ্চলে দিঘি খনন করা আর দিঘির উঁচু পাড়ে ফলদ নানান বৃক্ষ রোপণের কথা বলা রয়েছে। প্রজাহিতৈষী বা জনহিতকর কাজ হিসেবে খাল খনন, ইঁদারা খনন, নদীর পুনঃখনন বা জলাভূমির বহুমাত্রিক ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মৌসুমি বৃষ্টিপাত আর শীতকালের শুকনা মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত মাথায় রেখে এই জল ব্যবস্থাপনার ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। পরোক্ষভাবে, এই পুকুর বা দিঘিগুলো বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখত বলে অতিরিক্ত পানি দীর্ঘদিন জমিকে প্লাবিত করার সুযোগ কম পেত। পুকুর বা দিঘির গুরুত্ব তৎকালীন বসতির সীমানা ও যোগাযোগ নির্ধারণেও ভূমিকা রাখত। এই কৃত্রিম জলাশয়ের প্রতীকী, ধর্মীয় আর ব্যবহারিক গুরুত্বের আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার জগজ্জীবনপুরে অবস্থিত বৌদ্ধ মহাবিহারের নামকরণে। পাল বংশীয় শাসক প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, ওই মহাবিহারটির নাম ছিল নন্দদীর্ঘিকা মহাবিহার। জমির ধরন, মাটির প্রকৃতি, জমির প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রকারের জমিতে পুকুরের সংখ্যার হেরফেরও লক্ষণীয়। আমরা আমাদের গবেষণায় এই হেরফেরের সঙ্গে তৎকালীন পানি ব্যবস্থাপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছি। মানুষের বসতি, চাষাবাদ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বেলায় জল ব্যবস্থাপনা ছিল মানবীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশেও পুকুর বা দিঘির ভূমিকা খুব গুরুতর। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি যখন বৃষ্টির দিনে অথবা জোয়ার-ভাটার সময় জমি ও প্রাকৃতিক জলাভূমিকে প্লাবিত করে, তখন নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে ভূগর্ভস্থ পানির আধার হিসেবে এসব

টীকা : কাল-গণনার পরিভাষা হিসেবে এই লেখায় সাধারণ অব্দ এবং প্রাক্-সাধারণ অব্দ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনো কালপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারের তুলনায় এখন গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার (প্রচলিত ভাষায়, ইংরেজি ক্যালেন্ডার) নানা কারণেই সময় মাপক মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বায়িত হয়েছে। সেখানে খ্রিষ্টাব্দ ও খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ হিসেবে কাল গণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদেরা এই গণনার উপস্থাপনে সরাসরি খ্রিষ্টধর্মীয় ইতিহাস প্রকট থাকে বলে মনে করেন। তাই ধর্ম-বিযুক্ত উপস্থাপন করার জন্য এখন খ্রিষ্টাব্দের বদলে সাধারণ অব্দ/কমন এরা এবং খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরিবর্তে প্রাক্-সাধারণ অব্দ/বিফোর কমন এরা ব্যবহার করা হয়। এখানে ফারাক উপস্থাপনের পরিভাষা ব্যবহারে। গণনারীতি গ্রেগোরিয়ান কালপঞ্জির অনুসারেই হয়ে থাকে।

পুকুর খোঁড়া হতো। বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার অনেক পুকুর বা দিঘির সঙ্গে হজরত খান জাহান আলী (রহ.) অথবা তাঁর সঙ্গীদের সংশ্লিষ্টতা এখনো কথ্য ইতিহাসে বলা হয়।

অন্য শাসকেরাও ওই অঞ্চলে বসতি বা দুর্গ তৈরি করার জন্য বৃষ্টিপাত, জোয়ার-ভাটা ও নদীপ্রবাহের হেরফের সবিশেষ বিবেচনায় রাখতেন। সতীশ চন্দ্র মিত্রের *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* বইতে পরোক্ষভাবে এমন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জনশ্রুতিতে বেশ কয়েকটা বসতি বা প্রাচীরঘেরা বসতিকে বারভূঁইয়াদের অন্যতম প্রতাপাদিত্যের নির্মাণ হিসেবে বলা হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বেশ কিছু বসতিই আদি মধ্যযুগীয় বলে অনুমান করা যেতে পারে। যেমন খুলনার কয়রা উপজেলার বড়বাড়ি কিংবা সাতক্ষীরার শ্যামনগরের কিছু বসতি প্রতাপাদিত্যের কালেরও আগের। প্রতিটি বসতির সঙ্গে পুকুর বা দিঘির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে নৈমিত্তিক যাপনের জন্য (আর ধর্মীয় বিভিন্ন অনুশাসন পালনের জন্য) এই পুকুর বা জলাশয়গুলোর আবশ্যকীয়তা কতটা ছিল। জাতি, বর্ণ প্রথা আর সম্প্রদায়ের পরিচয় অনুসারে এসব জলাশয় ব্যবহারে শ্রেণীকরণ ছিল। শাসক বা সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি এসব পুকুর রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সমাজের বা সম্প্রদায়গুলোর অংশগ্রহণ দরকারি ছিল। জল ব্যবস্থাপনায় সামাজিক যুক্ততা, মানে বারোয়ারি বা শরিকি হিসেবে কোনো জলাশয়কে বিবেচনা করার রীতি এখনো কোথাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার আধুনিক ধারণা দিয়ে এই জলযুক্ত সম্পর্ককে বোঝা সম্ভব ছিল না। পরে এই জলাশয়গুলোকেই কলেরা বা ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক ব্যাধির প্রধানতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগ-সম্পর্কিত সমীক্ষা ও বিধিবিধানে। বুকানন বা মারটিনের বিরক্তি যার অপর নাম ভ্রান্তি তা অপর স্থানের ও কালের অন্য সমাজ এবং মানুষের জীবনে পানির ভূমিকা উপলব্ধি না করতে পারারই লক্ষণ।

ভারতীয় উপমহাদেশ, তথা বাংলা অঞ্চলের জল-জমির সম্পর্ক বদলের আরেকটা বড় ঘটনা ছিল রেলপথ তৈরি। জমির প্রকৃতি, ঢাল আর বৈচিত্র্য অনুসারে জল নিষ্কাশিত হওয়ার স্বাভাবিক যে পথ ও প্রক্রিয়া ছিল, সেই প্রক্রিয়া মাটি ফেলে উঁচু করে তৈরি জমির ওপরে রেললাইন বসানোর মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি, উপনিবেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে লাভবান হয়ে ধনী হয়ে ওঠা বিভিন্ন মানুষ (যাঁরা নিজেদের জমিদার বা রাজা হিসেবেও পরিচয় দিত বিগত দিনের অনুকরণে) শাসকদের পাশাপাশি অপরিকল্পিতভাবে হয়

ব্যবসার যোগাযোগের প্রয়োজনে নয়তো চটজলদি নদীর জলপ্রবাহের সমস্যা (বৃষ্টির দিনে পাড় ছাপিয়ে বন্যা বা শুকনার দিনে পানিশূন্যতা) সমাধানের জন্য যত্রতত্র খাল কেটে নদীর বাঁকগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটিকে যুক্ত করে দিতেন। আঁকাবাঁকা নদীর প্রবাহপথকে সরলরেখা করে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের সময় কমানোও উদ্দেশ্য ছিল। ঔপনিবেশিক এমন হস্তক্ষেপের বা টেরাফরমিংয়ের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে খুলনার রূপসা নদী। ভৈরব নদের দুই বাঁককে যুক্ত করতে রূপক সাহা নামের একজন ব্যবসায়ী খাল খনন করিয়েছিলেন। পরে ভৈরব নদের মূল জলপ্রবাহ এই খাল দিয়েই প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। এই জলপ্রবাহই এখন রূপসা নদী নামে পরিচিত। সাতক্ষীরা বা বাগেরহাট অঞ্চলে এমন অনেক ছোট বা বড় দৈর্ঘ্যের খাল পাওয়া যাবে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, উইলিয়াম উইলকক্সের প্রস্তাবিত ও ব্যাখ্যাকৃত *বাংলার প্রাচীন সেচব্যবস্থা* একটি নির্দিষ্ট ভূমিরূপ ও নদীব্যবস্থা প্রভাবিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাকে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও নিষ্কাশনব্যবস্থার জন্য সর্বজনীন বলা যাবে না। ঔপনিবেশিক আমলের সমীক্ষামূলক নথিপত্রেও বাংলার বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় পানির ব্যবহার ও সেচের ধরনের নমুনা পাওয়া যাবে।[১১]

ওপরের আলাপে ঔপনিবেশিক ও প্রাক্-ঔপনিবেশিক জলীয় যাপন ও তার রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দিলাম। তবে আধুনিক জল ব্যবস্থাপনার আগের লাখ লাখ বছরের মানুষের ইতিহাসে জলের সঙ্গে বসবাসের আর জল ব্যবস্থাপনার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে দুনিয়ার নানা অঞ্চলে। গত ১০-১৫ বছরে জলবায়ুর ইতিহাস বা প্রতিবেশের বিভিন্ন উপাদান আর আন্তসম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষকেরা কাজ করছেন। জলবায়ুবিজ্ঞান আর প্রত্নজলবায়ুবিদ্যার পাশাপাশি ভূক্ষেত্রীয় বা ল্যান্ডস্কেপ প্রত্নতত্ত্ব, নদীর ইতিহাস, জলের/তরলের প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক বাস্তুশাস্ত্র, প্রত্নবাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদি নানা নামে অতীতে মানুষ, জল ও জলবায়ুর মিথস্ক্রিয়া বোঝা ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক বা পললগত এবং উদ্ভিজ্জ অবশেষনির্ভর উপাত্ত খুঁজে বের করা হচ্ছে। এ ধরনের উপাত্তকে প্রক্সি-ডাটা বলা হয়ে থাকে। রাসায়নিক, আইসোটপিক, খনিজগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি গভীর সমুদ্রতল থেকে খুঁড়ে বের করা পলল বিশ্লেষণ করেই প্রত্নজলবায়ুগত নানা উপাত্ত সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। গণিত ও পরিসংখ্যানের বিভিন্ন মডেল তৈরি করে অতীতে জলবায়ু, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের হার, তার বদল ও আঞ্চলিক প্রভাব, জল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সেই হারের সম্পর্ক

আর মানুষের বসতি ও কর্মকাণ্ডের ওপর সেই বদলের প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করা হচ্ছে।

মানবসমাজের পরিবর্তনেও এই জলবায়ু ও প্রতিবেশের বদল বড় ভূমিকা রেখেছিল প্রাগৈতিহাসিক আমলে। এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। যেমন প্রত্নতত্ত্ববিদ আর প্রত্নজলবায়ুবিদগণ মনে করেন, আজ থেকে ১২ হাজার বছর আগে শেষ বরফ যুগের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই মানুষের অভিবাসন ও জীবনযাপনের বদলের সূত্রপাত ঘটে। মধ্যপ্রস্তর যুগে ছোট ছোট পাথর, হাড় ও কাঠের হাতিয়ার নিয়ে মানুষের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক নানা উৎস ব্যবহার করার সামর্থ্য বেড়ে যায়। সাম্প্রতিককালে বর্তমান তুরস্কের সাতলহাইউকে বা গেবিকি তেপসহ বেশ কিছু বসতি খনন করে খুঁজে পাওয়া গেছে অনেক নমুনা। এই বসতিগুলো প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই বসতিগুলো পরিকল্পিত নগরসদৃশ। যদিও বসতিগুলোর সময় প্রাক্-সাধারণ ৭০০০-৬০০০ অব্দ। তখনো কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস অনুসারে নগর সভ্যতার বিকাশ মেসোপটেমিয়া, মিসর, সিন্ধু অববাহিকা বা চীনে হয়নি। অক্সাস নদীর অববাহিকা অথবা দক্ষিণ আমেরিকাতেও হয়নি। নগর বিপ্লবের পরিচিত যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আর প্রত্নজলবায়ু ও প্রত্নপ্রতিবেশগত গবেষণা এই প্রশ্নগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। এমনকি মেসোপটেমিয়া, মিসর, সিন্ধু অববাহিকা বা চীনে কেবল নগরকেন্দ্রিক প্রত্নতত্ত্বচর্চার সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হচ্ছে, যখন এসব নগরকেন্দ্রের আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলে, ধরে-নেওয়া প্রতিকূল প্রতিবেশে মানববসতির আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এসব নতুন বসতি ব্যবস্থা আর প্রত্নপ্রতিবেশগত উপাত্ত উপযোগিতাবাদী বিকাশ ও বিলুপ্তি কিংবা অপর কোনো জনগোষ্ঠীর আগমন বা আক্রমণে বিলুপ্তির ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণিত করে চলেছে। মেসোপটেমিয়ায় জলাভূমিসহ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুবাহিত বৃষ্টিপাতের বদল এবং দীর্ঘ খরা ওই সভ্যতার বসতিগুলোর পরিবর্তন ও পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা আর সন্নিকটের অক্সাস নদী প্রভাবিত সভ্যতার মানুষের জীবনযাপন এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের বেলাতেও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের হার ও প্রবণতায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত হয়েছে। কোথাও দীর্ঘ খরা, আবার কোথাও অতিবৃষ্টি চাষাবাদ, জলব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্কে প্রভাব ফেলেছিল। নদীপ্রবাহের জলের পরিমাণ কমে এসেছিল। কোনো নদীর জলপ্রবাহ অন্য কোনো ছোট নালার মধ্য দিয়ে হঠাৎ করে প্রবাহিত হওয়া শুরু করেছিল। এই আকস্মিক বা

ধীরগতিতে নদীখাতে প্রবাহিত জলপ্রবাহের খাত বদলকে অ্যাভালসন (Avulsion) বলা হয়। মনে রাখতে হবে, মানববসতিগুলোর মধ্যের জটিল সম্পর্ক আর নগর ও অন্য ধরনের ছোট বসতির সম্পর্ক এই বদলের কারণে নিজেও বদলে গিয়েছিল। পাশাপাশি, চাষাবাদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষ কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রারিক্ত ব্যবহার মিলে একেকটি সভ্যতার বিশাল বিস্তৃত পরিসরে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে চলছিল। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন কেবল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবেই প্রথম ঘটেনি। মানুষের কার্যকলাপের কারণে জমি ও জলের সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ঘটনাও অ্যানথ্রোপোসিন যুগেই প্রথম নয়।

কিন্তু প্রাক্-ঔপনিবেশিককালের মানুষের প্রভাবে প্রকৃতির বদল বা বৈশ্বিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন আজকের অ্যানথ্রোপসিনের জলবায়ু পরিবর্তনের তুলনাও গুণগত ও মাত্রাগতভাবেই ভিন্ন। জলীয় যাপনের ঐতিহাসিক বোঝাপড়াই আমাদের এই গুণগত ও পরিমাণগত ফারাকের দিকে নজর দিতে বাধ্য করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অবিভক্ত বাংলা ও বাংলাদেশ অঞ্চলে এ ধরনের গবেষণার ঐতিহ্য তৈরি হয়নি। তবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা কিছু চেষ্টা করে চলেছি। বিভিন্ন সূত্র ও উপাত্ত থেকে নিচে কিছু উদাহরণ দিলাম। বাংলাদেশের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা, তিব্বত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রক্সি-ডেটা/পরোক্ষ উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব প্রক্সি-ডেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে স্পেলিওদেম। মেঘালয়ের বিভিন্ন গুহা থেকে সংগৃহীত স্পিলিওদেমের আইসোটোপ/রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে অতীতে বৃষ্টিপাতের হেরফের, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পানির পরিমাণ আর প্রবাহের হেরফেরের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন অনেক প্রত্নজলবায়ুবিদ এবং জলবায়ু বিজ্ঞানী।[১২] সাধারণত পানি জমে, চুইয়ে, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে গুহার মধ্যে ধীরে ধীরে জমা হওয়া এক ধরনের ডিপোজিট বা সঞ্চয়নকে স্পিলিওদেম বলে। এই ডিপোজিটের রাসায়নিক বিশ্লেষণ আর সময়কাল নির্ধারণ করে গাণিতিক পর্যালোচনার মাধ্যমে হাজার হাজার বছরের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের হার নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

আমি এখানে গত দুই হাজার বছরের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের হার নিয়ে প্রকাশিত হওয়া বিভিন্ন বিশ্লেষণের আলোকে মোটাদাগে দু-একটি ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করতে চাই। এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোটাদাগে বাংলা অঞ্চলের জলবায়ুর প্রধান প্রবণতাকে বিবেচনা করে গত ১৫০০ বছরকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথমটি হলো মধ্যযুগীয় উষ্ণ পর্ব অথবা মধ্যযুগীয়

জলবায়ু বিক্ষিপ্ততার পর্ব। এ পর্বে জলবায়ু বেশ কয়েকবার শুষ্ক ও তুলনামূলক শীতল দশা থেকে আর্দ্র ও উষ্ণ দশায় পরিবর্তিত হয়েছে। ১১২২ থেকে ১২০০ সাধারণ অব্দের মধ্যে মোটামুটি শক্তিশালী বর্ষাকাল ছিল। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের হার সবচেয়ে বেশিবার ওঠানামা করেছে সাধারণ অব্দ থেকে ১৪৫০ সাধারণ অব্দের মধ্যে। আনুমানিক ১২৪০ থেকে ১২৭৯ সাধারণ অব্দ আর ১৩৩০ থেকে ১৩৭০ অব্দের মধ্যে শুষ্কতার দশা ছিল। আনুমানিক ১৩১০ থেকে ১৩৩০ আর ১৪১০ থেকে ১৪৫০-এর মধ্যে আর্দ্রতার দশা ছিল। দশম শতকের প্রথমার্ধ থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি অবধি এই পর্বে যেমন নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি অবধি মেঘালয়সহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বঙ্গীয় বদ্বীপে জলবায়ু তুলনামূলকভাবে আর্দ্র ও উষ্ণ ছিল। তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও কম বৃষ্টিপাতের পর্বগুলোতে দীর্ঘ খরা ছিল। অন্যদিকে অধিক বৃষ্টিপাতের পর্বগুলোতে বড় ধরনের বন্যা হয়েছিল, নদীগুলোতে পানিপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। বৃক্ষবলয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণায়ও উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের সমর্থন পাওয়া গেছে। ব্রহ্মপুত্র নদে পানিপ্রবাহের পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে এই উপাত্তগুলোকে সম্পর্কিত করা গেছে। বড় বন্যার পর্ব আর দীর্ঘ খরার পর্বের সঙ্গে এই নদীর পানিপ্রবাহের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি চিহ্নিত হয়েছে।[১৩] এই প্রলম্বিত খরার কারণে বাংলা অঞ্চলের তৎকালীন সেন রাজবংশীয় শাসকেরাসহ পরবর্তী শাসকেরাও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন বলে একদল গবেষক প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের এই প্রস্তাবের সত্যতা যাচাই করা আরও গবেষণাসাপেক্ষ বিষয়। তবে, প্রলম্বিত খরা বা বন্যা এবং মৌসুমি বৃষ্টিপাতের বিক্ষিপ্ত আচরণ এখানকার চাষাবাদ এবং মানুষের জীবনের ওপর যে প্রতিকূল বা অনুকূল প্রভাব ফেলত, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন বরেন্দ্রের জগদ্দল মহাবিহারে সংকলিত *সুভাষিতরত্নকোষ* নামক কাব্যগ্রন্থে কোনো কোনো দরিদ্র কবিকে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষার কবিতা লিখতেও দেখা যায়। বৃষ্টি ও বন্যা ভবিষ্যতে নতুন ফসলের মাধ্যমে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে—এই আশা কবিতায় লিখে গেছেন কোনো কোনো কবি।[১৪]

অন্যদিকে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক অবধি পর্বটিকে ক্ষুদ্র বরফ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টিপাত ও শীতল জলবায়ুগত প্রবণতা ছিল এর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই যুগের মধ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ছোট ছোট পর্বে বৃষ্টিপাত বেড়েছে। তার আনুমানিক হিসাবও প্রত্নজলবায়ুবিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন। যেমন ১৪৫০ থেকে ১৫৪০ সাধারণ অব্দ এবং ১৬৭০ থেকে

১৭১০ সাধারণ অব্দের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। ১৭১০ থেকে ১৮০০ সাধারণ অব্দের মধ্যে বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীজুড়ে বৃষ্টিপাতের হার বেড়েছে ও কমেছে সবচেয়ে বেশিবার। ১৭৭০, ১৮৭০, ১৭৯০-৯৬ সালের প্রচণ্ড খরার প্রমাণ এসব উপাত্তের পাশাপাশি বিভিন্ন লিখিত উপাত্ত থেকেও পাওয়া যায়। ১৬৬৯, ১৭৮৩, ১৮৭৬, ১৮৯২, ১৮৯৭, ১৮৬৬ সালের খরার প্রমাণও ঐতিহাসিক উপাত্ত থেকেই পাওয়া যায়। আবার ঐতিহাসিক এবং ঔপনিবেশিক নথিপত্রে ১৭৮৭, ১৮৫০, ১৮৭০, ১৮৫৬, ১৮৬৬, ১৮৮৫, ১৮৯০, ১৮৩৮, ১৮৬৫ সালে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বড় বন্যার উল্লেখ মেলে।[১৫] বিংশ শতকের বিভিন্ন বছরের বন্যার কথা বা খরার কথা এখানে বিশদ উল্লেখ করা হলো না।

তৃতীয় কালপর্বটি হলো অষ্টাদশ শদক থেকে পরবর্তী সময়টা। এ পর্বটিকে সাম্প্রতিক উষ্ণতার যুগ হিসেবে অবহিত করা হয়। এ পর্বটি মোটামুটিভাবে অ্যানথ্রোপোসিন যুগের সমসাময়িক। দক্ষিণ এশিয়ায় তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, মৌসুমি বৃষ্টিপাতের হার ও ঋতুর পরিবর্তন, ঘন ঘন অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি এই কালপর্বের বৈশিষ্ট্য। মানবায়িত বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে এই কালপর্বটির বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রমাণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি কথা বলা করা দরকার। এসব গবেষণায় বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধির যে দশকওয়ারি হার বা পর্বওয়ারি হারের কথা প্রবণতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা করা হয়েছে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। হঠাৎ করে কোনো দশকে বা বছরে বদল ঘটা সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা অন্য কোনো ধরনের নথি বা উপাত্ত ছাড়া সম্ভব নয়। কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক আমলের নথিতে যতটা সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত বন্যা বা খরা বা বেশি/কম বৃষ্টিপাতের হদিস পাওয়া যায়, তেমন হদিস প্রাক্-ঔপনিবেশিক নথিতে খুব বেশি মেলে না। আমরা যেমন মোগল আমলের বিভিন্ন নথিতে প্রবল বৃষ্টিপাত বা বন্যার উল্লেখ কোথাও কোথাও পাই। বাংলা অঞ্চলের মৌসুমি জলবায়ু, বিশেষ করে বর্ষাকালের বৃষ্টি যেভাবে নদী-জলাভূমিসহ পুরো জমিনের চেহারা ও পরিচয় কিছু কালের জন্য বদলে দেয়, সেই বদল এই অঞ্চলের বাইরে থেকে আসা বা এই অঞ্চলে শাসন বা যুদ্ধ করতে আসা উত্তর ভারতীয় বা উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় এলাকার লোকজনকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে, প্রবল সংকটে ফেলেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং উত্তরাঞ্চলের বৃষ্টি ও জমিনের পরিবর্তন বাইরে থেকে আসা সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করেছে,

পর্যুদস্ত করেছে এবং পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছে বারংবার। মোগল আমলে এই উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে। মোগলদের আসাম (কামরূপ) অভিযান, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান যেমন বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিপাতের ফলে বদলে যাওয়া নদী ও জমিনের হিসাব না রাখতে পারায় ব্যর্থ হয়েছে; তেমনই নদী ও জলের দেশে যুদ্ধ করার জ্ঞান ও কৌশল প্রথম দিকে আয়ত্ত করতে না পারাও ছিল সেই ব্যর্থতার কারণ। যখন মোগলরা এখানকার নদীতে যুদ্ধ করার উপযোগী নৌবহর, নৌকা এবং সেনাবাহিনী গঠন করেছে, তখনই কেবল নৌপথের যুদ্ধে সাফল্য এসেছে। তবে সেই সাফল্যও সব এলাকায় একই রকম ছিল না; দীর্ঘস্থায়ীও ছিল না।[১৬]

মিনহাজ-ই-সিরাজের *তবকাত-ই-নাসিরী*তে গৌড়ে বাঁধ নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূপ্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তেও নদীর তীরে বারবার বাঁধ দেওয়া আর সেই বাঁধ ভাঙার সাক্ষ্য রয়েছে। আরও অনেক পরে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত ঘোড়াঘাটের কাছে রংপুরের পীরগঞ্জের কাটাদুয়ার থেকে প্রাপ্ত শাহ ইসমাইল গাজীর জীবনী *রিসালত-উস-সুহাদা*-তেও পঞ্চদশ শতকের গৌড়ে বন্যা মোকাবিলায় শাসকদের সমস্যায় পড়ায় পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে।[১৭] জীবনীর বয়ান অনুসারে, শাহ ইসমাইল গাজীর অলৌকিক মাহাত্ম্য গৌড়বাসী টের পান যখন তিনি গৌড়ের বন্যার জন্য তৈরি করা বাঁধ রক্ষা করেন। পাশাপাশি গৌড়ের সন্নিকটে বালুপুরে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বারবার বন্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শীনা পাঁজা, অরুণ নাগ এবং সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রতিবেদনে স্পষ্টতই সাধারণ অষ্টম শতাব্দী থেকে ১৭০০ শতাব্দী অবধি কালিন্দী নদীর কাছের এই বসতি বারবার বন্যায় প্লাবিত হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। বন্যার পানিতে বহন করে আনা পলিতে বসতি পুরো বা আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। আবারও মানুষ এসে ওখানে পরে বসতি তৈরি করেছে।[১৯] সম্প্রতি সুস্মিতা বসু মজুমদার মহাস্থানে প্রাপ্ত বিখ্যাত ব্রাহ্মীলিপিটি (বর্তমানে কলিকাতার জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে) পুনঃপাঠ করেছেন। আনুমানিক প্রাক্-সাধারণ চতুর্থ-তৃতীয় শতকের এই লিপিটিতে মৌর্য রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসকের বন্যায় আক্রান্ত 'সমবঙ্গীয়'দের (তৎকালীন বঙ্গ জনপদের বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজ্যের বা জাতির মিলিত নাম; বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মিলে ছিল সে সময়ের বঙ্গ) অনুদান হিসেবে ধানের বীজ এবং অর্থ প্রদানের উল্লেখ রয়েছে বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।[২০]

বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বরের বসতি সেই সময়ের নদীব্যবস্থার বদল ও

বন্যায় প্রভাবিত হওয়ার ব্যাখ্যা আমরা ভূপ্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের ভিত্তিতে করার চেষ্টা করেছি।[২১] প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক খনন প্রতিবেদনেও আদি ঐতিহাসিক যুগে (আনুমানিক প্রাক্-সাধারণ ৪র্থ-৩য় শতক) পত্তন হওয়া এই বসতিটির বন্যার দ্বারা প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হওয়ার সাক্ষ্য মিলেছে। সেই সময়ের ব্রহ্মপুত্র নদীব্যবস্থার বন্যা ও নদীর খাতের বদল বসতিটির বিভিন্ন আলামতকে স্থানান্তরিত ও ধ্বংস করেছিল বলে আমরা অনুমান করেছি। একটা সময়ে এই বসতি পরিত্যক্ত হয়। আনুমানিক তিন-চার শ বছরের একটি পর্বের পরে আবারও মানুষ এসে এখানে সাধারণ অষ্টম-নবম শতকে বসতি তৈরি করে বলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খনন প্রতিবেদনের প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অনুমিত হয়।[২২]

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচালিত ভূপ্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ওখানকার নদীগুলোর অব্যাহত রূপ ও স্থানবদলের সঙ্গে মানুষের বসতির স্থান, রূপ ও প্রকৃতি বদলের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। করোতোয়া নদীব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বগুড়ার মহাস্থানগড় (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) থেকে শুরু করে উত্তরে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ধরে উত্তরে গেলে নদীর স্থান ও প্রবাহ বদলের সঙ্গে মানুষের বসতির নানা রকমের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি আর স্থানের বদল দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দিনাজপুরের কান্তনগর, পঞ্চগড়ের ভিতরগড় এবং নীলফামারীর ধর্মপালগড়ে প্রাচীরবেষ্টিত মানুষের বসতিগুলো যথাক্রমে ঢেপা, শালমারা ও সুই নদীকে (তিস্তার প্রত্নপ্রবাহ) প্রাচীরবিশিষ্ট পরিসরের মধ্যে এনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে বা কাহারোলে অথবা রানীশংকৈলের আদি-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগের বসতিগুলো কেবল নদীর পাশেই গড়ে ওঠেনি; বরং নদীর স্থান ও প্রবাহের বদল এবং বিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের নথি ও মানচিত্র আর পরবর্তী গবেষণায় ১৭৮৭ সালের বড় বন্যায় সেই সময়ের তিস্তা নদীর পানিপ্রবাহের পরিবর্তন, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি ধীরে ধীরে ঘটা ব্রহ্মপুত্র নদের পানিপ্রবাহের বদলের কথা আমরা জানি। বন্যা কিংবা ভূমিকম্প পানিপ্রবাহের এই খাত বদলের সূত্রপাত ঘটালেও এই বদল সংঘটিত হয়েছিল কয়েক দশক ধরে।[২৩]

নদীপ্রবাহের খাত বদল অথবা নদীর খাতের একদিক থেকে অন্যদিকে স্থানিক বদল এই বদ্বীপের নদ-নদীর স্বাভাবিক চরিত্র। ভূবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, ব্রহ্মপুত্র নদ একদিক থেকে অন্যদিকে বেশ কয়েকবার দীর্ঘ প্রবাহ ধরে পানিপ্রবাহের খাত বদল করেছে। একই সঙ্গে একটি বিনুনিসদৃশ নদী হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে

তুলনামূলক ক্ষুদ্রতর স্থানিক পরিসরে এই নদের রৈখিক খাত বদল ঐতিহাসিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। তিস্তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পঞ্চগড় থেকে শুরু করে যমুনার বর্তমান মিলনবিন্দু অবধি তিস্তা নদী প্রাক্-ঔপনিবেশিককালেও অনেকবারই প্রবাহপথ ও খাতের বদল ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোনো নদী পাওয়া যাবে না, যে নদী স্থির, অনড় আর প্রবাহহীন ছিল। নদীগুলোর অনড় দশা বা অনেক নদীর ক্ষীণকায়া, মৃত দশা গত ৫০ থেকে ৬০ বছরের নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি ব্যবহারের রূপান্তরের প্রতিক্রিয়ামাত্র।

জলীয় জীবনের ইতিবৃত্ত জানাশোনা এবং নিদানের খোঁজ

আমাদের দেশে নদী, বন্যা, চাষাবাদ, পানি ব্যবস্থাপনা ও নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণার সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেসব গবেষণায় নদী, জল ও জলীয় যাপনকে দীর্ঘকালিক এবং বিবিধ স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা খুবই গৌণ। এই প্রবন্ধের আলাপ থেকে পাঠকদের মনে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে গত এক দশকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানে প্রত্ন-জলবায়ু, নদী ও জলের ইতিহাস, বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ স্থানিক-কালিক পরিসরে যে বিপুল উপাত্ত-আলোচনা ও তর্ক তৈরি হয়েছে, এই প্রবন্ধে তার কিঞ্চিত ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছি কেবল। যে প্রবল জ্ঞান ও চিন্তার প্রভাবে এখন নদী ও জলের সঙ্গে যাপন করি আমরা, সেখানে নদী-জল-জলীয় যাপনে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের যেকোনো আলাপচারিতাকে আপ্রাসঙ্গিক, গৌণ আর বাহুল্য বলে মনে করা অন্যায় হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আর জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ার হুমকির মধ্যে থাকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম। দাপুটে জলবায়ু পরিবর্তন ও তাকে মোকবিলা করার যে চিন্তা ও তৎপরতা চলমান, সেখানে আধুনিক উন্নয়ন ও প্রগতির ধারণাকে প্রশ্ন করার সুযোগ কম। মানবায়িত জল ব্যবস্থাপনার বিকল্প খোঁজার তৎপরতা জারি রাখার সুযোগও কম। চিন্তা ও চর্চার প্রতিষ্ঠিত এবং দাপুটে ঐতিহ্য বিকল্প চিন্তা ও চর্চার কোনো সুযোগই রাখতে দেয় না। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়ন ও তৎপরতা (সাসটেইনেবিলিটি) আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অনবরত লড়াই করে টিকে থাকা (রেসিলিয়েন্স) প্রধান দুটো জনপ্রিয় ধারণা। এই ধারণাগুলোর মাধ্যমে দিয়ে জল ও জমিনের মিথস্ক্রিয়ার স্থানিক বহুত্ব ও কালিক বদলকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা করা সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন ধারণা আমাদের বহু বছরে গড়ে ওঠা বহুত্বকে আমলে নেওয়া জলীয় যাপনের বিরোধী। এই অনুধাবন করার জন্য আমার আজকের আলাপ একটি সূত্রমাত্র। জলীয় যাপনে যে বহুত্বের উদ্‌যাপন ছিল, সেই ঐতিহ্য বর্তমানের চিন্তা ও তৎপরতায় গৌণ। সেই পুরোনো ঐতিহ্যে নদীভাঙন, খরা কিংবা বন্যা 'দুর্যোগ' বা 'অস্বাভাবিক' কিছু নয়। জলীয় যাপনে প্রকৃতির এমন সক্রিয়তাই স্বাভাবিক। এ কথা মেনে নিতে আপনাদের অস্বস্তি হলেও সেই অস্বস্তিতে আক্রান্ত হওয়াও সবার জন্য জরুরি। প্রাক্-ঔপনিবেশিককালে মানুষ বিভিন্নভাবে এই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সক্রিয়তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে, অভিযোজন করে চলতে চেয়েছে। নানা অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন বসতিকে, মানুষের জীবনযাপনকে আর বেঁচে থাকা না-থাকাকে প্রভাবিত করেছে। সে কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বৈশ্বিক পরিসরে স্থান-কালের বহুত্বকে অগ্রাহ্য করে (টেকসই) উন্নয়নের ধারণা ও তৎপরতার মাধ্যমে জলবায়ুর বিপর্যয়ের মোকাবিলা আমরা এখন যেভাবে করছি, তার ব্যর্থতা অনিবার্য। মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ইতিহাসে সৃষ্টি-ধ্বংস-স্থিতিশীলতা এবং জল-স্থল-অন্তরিক্ষের সম্মিলিত বিজড়ন নিতান্তই নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক। জলীয় যাপনের এই ঐতিহাসিকতাকে আমলে না নিলে আমাদের অস্তিত্ব টিকবে না। আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে পারব না পুরোপুরি। সেই সময়ে, সেই স্থানে ফিরেও যেতে পারব না। এই ইতিহাস-উপলব্ধি আমাদের সংবেদন ও নৈমিত্তিক যাপনকে প্রভাবিত করতে পারে। আপাতত এটুকু ইতিহাসচেতনা সবার মধ্যে সংক্রমিত হলেই এই আলাপ প্রাসঙ্গিক আর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

● **স্বাধীন সেন** জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের ভিত্তিতে বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দেবেশ রায়, তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৫৭-৫৮

২. Dilip Da Cunha, The Invention of Rivers. হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ডিজাইনে উপস্থাপিত ডেভিড কেলি বক্তৃতা ২০১৯। বক্তৃতার লিংক পাওয়া যাবে : https ://www.youtube.com/watch?v=39qJ3DKnPkg&t=43s.

৩. Dipesh Chakrabarty, *The Climate of History in a Planetary Age*. The Chicago

University Press, 2021. Fluck, H. and Guest, K., Climate Change and Archaeology. An Introduction, *Internet Archaeology* 60. https ://doi.org/ 10.11141/ ia.60.1. 2022. Ariane Burke et al. The archeology of climate change : the case for cultural diversity. *PNAS* [doi : 10.1073/pnas. 2108537118, 2021. Debjani Bhattacharyya, *Empire and Ecology in the Bengal Delta : The Making of Calcutta*, Cambridge, 2018. Martin Mahony, and Georgina Endfield, Climate and colonialism, *Wires Climate Change*, 9(2), 2018, [https ://doi.org/10.1002/wcc.510]. Megan Sickmueller, Capitalism, Colonialism, and Climate, Retrospect Journal, [https :// retrospectjournal.com/2021/11/14/capitalism-colonialism-and-climate/]. Rohan D'Souza, Drowned and Dammed : Colonial Capitalism and Flood Control in Eastern India, Oxford University Press, Delhi, 2016.

৪. Anthropocene Epoch. [https ://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch]. Simon L. Lewis and Mark A. Maslin, Defining the Anthropocene, Nature 519, 171-180 (2015). [https ://doi.org/10.1038/nature14258].

৫. Lilley, K D, Surveying empires : Archaeologies of colonial cartography and the Great Trigonometrical Survey of India. In A. Kent, S. Vervust, I. Demhardt, N. Millea eds., *Mapping Empires : Colonial Cartographies of Land and Sea*, New York, 2020. Gloria Kuzur and Swagata Basu, Mapping governmentality of Colonial spaces in India. *Indian Cartographer*, 35. 2015. Ujjayan Bhattacharya, From Surveys to Management : The Early Colonial State's Intervention in Water Resources of Bengal. *Indian Historical Review*, 44(2). [https ://doi.org/10.1177/0376983617726471]. Matthew Edney, *Mapping an Empire : The Geographical Construction of British India 1765-1843*, Chicago, 1997.

৬. Dilip Da Cunha, The Invention of Rivers. হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ডিজাইনে উপস্থাপিত ডেভিড কেলি বক্তৃতা ২০১৯। বক্তৃতার লিংক পাওয়া যাবে : https ://www. youtube.com/ watch?v=39qJ3DKnPkg&t=43s. Kuntala Lahiri-Dut, Beyond the Water-Land Binary in Geography : Water/Lands of Bengal Re-Visioning Hybridity, ACME : An International Journal for Critical Geographies. 13(3), 2014. Lafaye de Micheaux, F, J Mukherjee & CA Kull, When hydrosociality encounters sediments : Transformed lives and livelihoods in the lower basin of the Ganges River. *Environment and Planning E : Nature and Space*, 1 (4). [doi : 10.1177/2514848618813768].

৭. Nilanjana Mukherjee, *Spatial Imaginings in the Age of Colonial Cartographic*

Reason Maps, Landscapes, Travelogues in Britain and India, Routledge, 2020. Theodore Grudin, ed., *Nature and Colonialism : A Reader*, Santa Clara, 2020. Alfred Crosby, *Ecological imperialism, the biological expansion of Europe, 900-1900*, Cambridge, 2004. K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests, state making and environmental change in eastern India*, Delhi, 1999. Simon L. Lewis and Mark A. Maslin, *The Human Planet : How We Created the Anthropocene*. London, 2018. Christopher H. Trisos, Jess Auerbach & Madhusudan Katti, Decoloniality and anti-oppressive practices for a more ethical ecology.

৮. Ujjayan Bhattacharya, From Surveys to Management : The Early Colonial State's Intervention in Water Resources of Bengal. Indian Historical Review, 44(2). [https ://doi.org/10.1177/0376983617726471].

৯. Buchanon (Hamilton), F., *A geographical, statistical and historical description of the district, or zila of Dinajpur in the province, or Soubah of Bengal*. Calcutta, 1833. Montegomary Martin, *The history, antiquities, topography and statistics of Eastern India; comprising the districts of Behar, Shahbad, Bhagulpoor, Goruckpoor, Dinajpoor, Puraniya, Rungpoor & Assam in relation to their geology, mineralogy, botany, agriculture, commerce, manufactures, fine arts, population, religion, education, statistics, etc.* (vol. 2 and 3) London, 1838.

১০. *ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, করতোয়া-মাহাত্ম্যম, প্রাচ্যবিদ্যা* পত্রিকা ২, ২০০১।

১১. সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯১৪। Christopher V. Hill, Water and Power : Riparian Legislation and Agrarian Control in Colonial Bengal. *Environmental History Review*, 14(4), 1990). Tirthankar Ghosh, Rivers, Land and State : Embankment and Ecology in Colonial North Bengal. *Studies in Peoples History*, 8(1) [https ://doi.org/10.1177/2348448921999041]. Iftekhar Iqbal, The Bengal Delta : Ecology, State and Social Change, 1840-1943. London, 2010. Sir William Wilcocks, Lectures on the Ancient system of irrigation in Bengal and its application to modern problems. Calcutta, 1930. Erica Mukherjee, The Impermanent Settlement : Bengal's Riparian Landscape, 1793-1846. *South Asian Studies*, 36, 2020 [https ://doi.org/10.1080/02666030.2019.1592941].

১২. Nikita Kaushal, Sebastian F. M. Breitenbach, Franziska A. Lechleitner, Ashish Sinha,Vinod C. Tewari, Syed Masood Ahmad, Max Berkelhammer, Shraddha Band, Madhusudan Yadava, Rengaswamy Ramesh and Gideon

M. Henderson, The Indian Summer Monsoon from a Speleothem 18O Perspective—A Review, *Quaternary* 1(3), 29, 2018 [https ://doi.org/10.3390/quat10300292018]. Som Dutt, Anil K. Gupta, Hai Cheng, Steven C. Clemens, Raj K. Singh, Vinod C. Tewari, Indian summer monsoon variability in northeastern India during the last two millennia, *Quaternary International*, 571, 2021, [https ://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.021].

১৩. Anil K. Gupta, Som Dutt, Hai Cheng, Raj K. Singh, Abrupt changes in Indian summer monsoon strength during the last ₹900 years and their linkages to socio-economic conditions in the Indian subcontinent. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 536, 2019, [https ://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109347].

১৪. Daniel H. H. Ingalls, *An anthology of Sanskrit Court Poetry : Vidyakara's Subhasitaratnakosa*, Cambridge, 1965. আরও দেখুন, Sheena Panja, Monuments in a flood zone : 'builders' and 'recipients' in ancient Varendri, (Eastern India and Bangladesh). *Antiquity*, 77(297), 2003, [doi :10.1017/S0003598X00092553]. একটি উদাহরণ হলো : বউগো, কোনোভাবে আমাদের ও বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখো/ গরমের মাসগুলো পার হওয়া পর্যন্ত/ তখনই বৃষ্টি আসবে, অনেক লাউ-কুমড়া ফলবে/ আর আমরা রাজার মতন বাঁচবো [অনুবাদ লেখকের]। এই সংকলনে কেবল বর্ষা নিয়েই একটি আলাদা অংশ রয়েছে।

১৫. Anil K. Gupta, Som Dutt, Hai Cheng, Raj K. Singh, Abrupt changes in Indian summer monsoon strength during the last ₹900 years and their linkages to socio-economic conditions in the Indian subcontinent. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 536, 2019, [https ://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109347].

১৬. Pratyay Nath, *Climate of Conquest : War, Environment, and Empire in Mughal North India*, London, 2019.

১৭. Minhaj-ud-Din, Abu-Umar-I-Usman, M., *Tabakat-i-Nasiri : a general history of the Muhammadan Dynasties of Asia including Hindiustan from A. H. 194 [810 A.D.], to A. H. 658 [1260 A. D.] and the irruption of the infidel Mughals into Islam*, vol. 1 and 2. Translated from Persian by H. G. Raverty. London, 1881.

১৮. Damant, G. H., Notes on Shah Ismail Ghazi, with a sketch of the contents of a Persian MS., entitled 'Risalatush-Shuhada,' found at Kanta Duar, Rangpur. *Journal of the Asiatic Society of Bengal.* XLIII(1), 215-239, 1874.

১৯. Sheena Panja, Arun K. Nag, and Sunanda Bandopadhyay, *Living with floods :*

archaeology of a settlement in the Lower Ganga Plains, c. 600-1800 CE. New Delhi, 2015.

২০. Sushmita Basu Majumdar, Looking at the Empire from Regional Perspective : The Mauryas Revisited. A Lecture delivered at Department of History, University of Delhi, 2022 [available at : https ://www.youtube.com/watch?v=UkphQQh0ZCU&t=2731s].

২১. Mohammad Kamal Hossen Aksanda, Pierluigi Rosina, Pedro P. Kunha, Swadhin Sen and S. M. K. Ahsan, Alteration of the Alluvial Deposits of Wari-Bateshwar : Geoarchaeological Relevance of the Characterization of Grain Size and Clay Mineralogy. *Pratnatattva*, 21, 2015.

২২. মো. মাহাবুব-উল-আলম, তানিয়া সুলতানা এবং সাবিনা ইয়াসমিন, উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন (২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)। ঢাকা, ২০২০। Gang Hu, Ping Wang, Sufi Mostafizur Rahman, Dehong Li, Muhammad Mahbubul Alam, Jiafu Zhang, Zhengyao Jin, Anchuan Fan, Jie Chen, Aimin Zhang, and Wenqing Yang, Vicissitudes experienced by the oldest urban center in Bangladesh in relation to the migration of the Brahmaputra River. Journal of Quarternary Science, 35(8), 2020. [https ://www.researchgate.net/publication/344179766_Vicissitudes_experienced_by_the_oldest_urban_center_in_Bangladesh_in_relation_to_the_migration_of_the_Brahmaputra_River]

২৩. Swadhin Sen and A. K. M. Khorshed Alam, Chronicles of perpetually reconfiguring entanglements : a precursory understanding of the landscape archaeology of Teesta Megafan of Bangladesh. In Swadhin Sen, Supriya Varma and Bhairabi Prasad Sahu eds., The Archaeology of Early Medieval and Medieval South Asia : Contesting Narratives from the Eastern Ganga-Brahmaputra Basin, 2013 [in press]. Swadhin Sen, Early Medieval Settlements on the Landscape Context in Varendri/ Gauda : An outline on the basis of total surveying and excavations in Dinajpur-Joypurhat District, Bangladesh. *Pratnasamikha New Series* 4, 2017. Swadhin Sen and Wahid Palash, 'Oh my river with deep water, I am floating on your water, ever since my birth 'i : Non-western perspectives on reconfigurations of embodiments of water and landscape with special reference to contemporary archaeological discourse. In Rila Mukherjee, ed., *Living with Water : Peoples, Lives and Livelihoods in Asia and Beyond*, New Delhi, 2017.

আন্তর্জাতিক

‘গর্বাচেভকে বোঝা শক্ত’

উইলিয়াম টবম্যান

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ নেতা মিখাইল গর্বাচেভ (২ মার্চ ১৯৩১-৩০ আগস্ট ২০২২) সম্প্রতি গত হয়েছেন। গর্বাচেভের রাজনৈতিক জীবন ততটা জটিল নয়, তবে কী তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একদলীয় শাসনব্যবস্থার মুঠি আলগা করতে প্ররোচিত করেছিল, তা স্পষ্ট নয়। তিনি বিদেশে নন্দিত কিন্তু দেশে নিন্দিত। অন্যান্য রুশ নেতার তুলনায় সাদামাটা ও বুদ্ধিজীবী গোছের এই নেতা, তারপরও গত শতকের সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত রাষ্ট্রনায়কের সারিতেই অবস্থান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর প্রায় ৩৩ বছর পার হলেও এককথায় বলা যায় না যে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে মুক্ত করেছিলেন নাকি ইতিহাসের আরও কষ্টকর যাত্রার সূচনা করে দিয়েছিলেন। গর্বাচেভ কেবল একটি মহা ট্র্যাজেডিরই জন্ম দেননি, তিনিও পরিণত হয়েছিলেন ট্র্যাজিক চরিত্রে। অথচ তিনি ভেবেছিলেন গ্লাসনস্ত (খোলা হাওয়া) ও পেরেস্ত্রইকা (সংস্কার) কর্মসূচি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে মুক্ত ও বিকশিত করছেন, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আনছেন। কিন্তু স্বদেশের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী নেতাদের কাজ আর পশ্চিমা বন্ধুদের ফাঁপা আশ্বাসের মধ্যে পড়ে গেলেন। এই রুশ সংস্কারক তাঁর আসল কাজ যে রাষ্ট্র সংস্কার করা, তা অনিষ্পন্নই রয়ে গেছে দেখে বিদায় নিলেন। মিখাইল গর্বাচেভের জীবনীকার মার্কিন লেখক উইলিয়াম টবম্যানের এই লেখা গর্বাচেভের ব্যক্তিচরিত্রের কিছু দিক বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **গোলাম মোর্শেদ**।

মিখাইল গর্বাচেভ ছিলেন একজন ভদ্রগোছের মানুষ; তাঁর দেশের নেতা হওয়ার জন্য খানিকটা বাড়াবাড়ি রকমেরই ভদ্র ছিলেন তিনি। আর এ কথা আজ দিবালোকের মতোই প্রশ্নাতীত।

গর্বাচেভ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। শেষাবধি দেশটিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তনও করেছিলেন। অথচ যে মানুষ ও গোষ্ঠীগুলোকে তিনি মুক্ত করেছিলেন, তাদের কাছে পরে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। শীতলযুদ্ধের অবসানে তাঁর কৃতিত্ব বিশ্বের আর যেকোনো নেতার চেয়ে বেশি। যদিও তিনি জীবদ্দশায় বিশ্বময় যুদ্ধের নতুন এক সূচনা দেখে গেছেন। দেশ আর দেশের বাইরে জুলুম ও সহিংসতাকে ব্যবহার না করে চলার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন তিনি। অথচ যাঁকে তিনি একসময় সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী সেই ভ্লাদিমির পুতিন দেশ পরিচালনায় ভরসা করছেন নিপীড়ন আর সহিংস আগ্রাসনের ওপর। রুশ চিন্তক দিমিত্রি ফুরমানের মতে, গর্বাচেভ ছিলেন 'রুশ রাজনৈতিক ইতিহাসের একমাত্র প্রতিনিধি, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও শুধু ন্যায়পরায়ণ নৈতিক মূল্যবোধের কারণে স্বেচ্ছায় সেই ক্ষমতা শুধু খর্বই হতে দেননি, তা পুরোপুরি খোয়ানোর ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছেন।' প্রধানত এ কারণে তাঁকে সমালোচকদের, মূলত যাঁরা রুশ, প্রচণ্ড পরিহাস সহ্য করতে হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি আহাম্মক, অপয়া। যদিও পশ্চিমা দুনিয়ার বড় এক অংশে তিনি ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছেন।

গর্বাচেভ ছিলেন বিরল রকম আশাবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী, এটা সম্ভবত তাঁর ত্রুটিও। যে দেশের লোকেরা কখনো জানেনি যে গণতন্ত্র কী, সেই দেশে স্বাধীনতা আনতে গিয়ে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, এ ছাড়া তাঁকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তিনি এমন এক কর্তৃত্ববাদী শাসনে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখানে নাগরিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা হতো। তারপরও গর্বাচেভ সোভিয়েত নাগরিকদের স্বশাসনের ক্ষমতায় অতিমাত্রায় আস্থা রেখেছিলেন। দুই ক্ষেত্রে তিনি পরিস্থিতি সামলানোয় নিজের ওপর মাত্রাছাড়া ভরসা করেছিলেন। প্রথমত, কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের বেলায়, পরে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, বরিস ইয়েলৎসিনের ব্যাপারে, যিনি তাঁকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। রাজনীতিকদের বিশেষত রুশ রাজনীতিকদের থেকে তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন এক জায়গায়। তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি ছিলেন একান্ত নিবেদিত। যদিও জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁকে পরিবার ছাড়াই কাটাতে হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে তাঁর স্ত্রী রাইসা মারা যান; কন্যা আর দুই নাতনি দেশ ছেড়ে থিতু হন জার্মানিতে।

১৯৮৮ সালে আমি ও আমার স্ত্রী এক শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচির অধীনে পাঁচ মাস মস্কোয় থেকেছিলাম। সে সময় গর্বাচেভ তাঁর গ্লাসনস্ত (খোলা হাওয়া) ও পেরেস্ত্রইকা (সংস্কার) কর্মসূচির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীকে আরও শান্তিপূর্ণ জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। কিন্তু তাঁকে ভালোভাবে জানার সুযোগটি এসেছিল ২০০৫ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর। এর প্রায় এক দশকের বেশি আগে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম ও শেষ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। পরের ১৪ বছরে তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। যেসব গুণের জন্য তিনি একই সঙ্গে একজন প্রশংসনীয় অথচ নাজুক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, সেসবের পরিচয় আমি সরাসরিই জানতে পেরেছি।

গর্বাচেভের জীবনী লেখার পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার পর ভাবলাম, একজন পশ্চিমা লেখকের প্রতি তাঁর যে বদ্ধমূল সন্দেহ থাকার কথা, শুরুতেই আমাকে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। সে সময় রাশিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা একদম তলানিতে নেমে গিয়েছিল। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে তিনি ১ শতাংশের কম ভোট পান। তাই ভাবলাম, ওই সময় তাঁকে প্রস্তাব করলে হয়তো তিনি ফিরিয়ে দেবেন না।

দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে আমি গর্বাচেভকে প্রস্তাবটি দিই। প্রথমজন তাঁর দীর্ঘদিনের অতি ঘনিষ্ঠ সহকারী আনাতোলি চেরনিয়েভ। ইতিহাসবিষয়ক কয়েকটি সম্মেলনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। দ্বিতীয়জন আমেরিকার রুশ-বিশারদ স্টিফেন এফ কোহেন। তিনি ছিলেন গর্বাচেভ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় ছিল বলে প্রথমেই গর্বাচেভের কাছে জীবনী লেখার অনুমতি চাইনি (না শোনার ভয় ছিল); বরং বলেছিলাম আমি তাঁর জীবনী লেখার কাজটি করছি আর এ জন্য তাঁর কিছু সহযোগিতা চাই। তাঁর মন গলাতে তাঁকে আমি ইংরেজিতে আমার লেখা *নিকিতা খ্রুশ্চেভের জীবনী* বইটি পাঠাই। পরে সেটির রুশ অনুবাদও দিয়েছিলাম। ওসবের কোনো প্রভাব পড়েছিল কি না, ঠিক জানা নেই। কারণ, চেরনিয়েভ আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে গর্বাচেভ অন্য কারও সুখ্যাতির বিষয়ে খুবই সতর্ক। এমনকি যারা তাঁকে একরকম পূজা করে, সেসব কাছের লোকের ব্যাপারেও তিনি হুঁশিয়ার। পরে যখন গর্বাচেভের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, চাপা স্বরেই তিনি বলেছিলেন 'খাসা বই'।

গর্বাচেভ একসময় সহযোগিতা করতে রাজি হলেন। আর প্রায় এক বছর পর তাঁর সম্মানে মস্কোতে আয়োজিত এক কনসার্টে তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রী জেনকে (অ্যামহার্স্টের রুশ ভাষা, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ের শিক্ষক) আমন্ত্রণ জানান। জেনের দুই গালে তিনবার চুমু দিয়ে আমাদের আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে তিনি পুরোনা স্লাভ ধর্মভাষায় বলেন, 'পিতা, তাঁর পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে।' জেন অবশ্য ঠিক ঠাহর করতে পারেনি যে নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট রাশিয়ার সাবেক নেতা ওর সঙ্গে কি ঠাট্টা করেছিলেন নাকি অন্য কিছু।

'বইয়ের কাজ কেমন চলছে?' গর্বাচেভ জানতে চান। অনুতাপের সুরে বলি, 'একটু ধীরে।' উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। গর্বাচেভকে বোঝা শক্ত।' তাঁর রসবোধ ছিল একটু অন্য ধরনের। অবশ্য নিজের ব্যাপারে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে প্রথম পুরুষে (থার্ড পারসন) প্রকাশ করার অভ্যাসটি তাঁর প্রচণ্ড অহংবোধের জানান দেয়। এ জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রে মুশকিলেও পড়েছেন। ২০০৬ সালের মার্চে মস্কো শহরতলির একটি অখ্যাত ব্যক্তিগত মিলনায়তনে তাঁর ৭৫তম জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও একই বছরে ইয়েলৎসিনের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল পুতিনের ক্রেমলিনে। যাহোক, নিজের জন্মদিনের পার্টিতে তাঁর উদ্দেশে বিশ্বনেতাদের কারও কারও সশরীর হাজির হয়ে দেওয়া বক্তব্য এবং অন্যদের রেকর্ড করা উচ্ছ্বসিত গুণগান যখন বাজানো হচ্ছিল, তখন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে খ্রুশ্চেভের আমেরিকান জীবনীকার এবার গর্বাচেভের জীবনী লেখার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

গর্বাচেভের আমলে মস্কোতে কর্মরত ছিলেন এমন এক পশ্চিমা রাষ্ট্রদূত আমাকে পরে একবার বলেছিলেন, 'গর্বাচেভ খুব জটিল কোনো মানুষ নন।' সম্ভবত তাঁর কাছে গর্বাচেভকে জটিল বলে মনে হয়নি, কিন্তু এক দশকের বেশি সময় ধরে আমি চেষ্টা করেছি শুধু এটা বুঝতে যে, যে দেশ গণতন্ত্র সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা গর্বাচেভ কী করে ভাবতে পারলেন।

২০০৭ সালের বসন্তে, জেন ও আমি রাশিয়ায় কয়েক মাস কাটাই। আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েক দফা সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি চেয়ে অবশেষে 'অন্তত একটি' সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলল। প্রথমটি ঠিকঠাকমতো চললে পরে আরও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ মিলবে, এমন আভাসও পাওয়া গেল।

তাই দুটি বুদ্ধি খাটালাম। তিনি আগে বলেছেন বা লিখেছেন, এমন কোনো কিছুর জের টেনে প্রতিটি প্রশ্নে যাওয়া, যাতে মনে হয় যে আমি বেশ প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি এবং তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ না পান। দ্বিতীয়ত, তাঁর পিতামহের ব্যাপারে প্রশ্ন করে আলাপ শুরু করা। এ ক্ষেত্রে আমার ভাবনাটি এমন ছিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার আলাপী সাক্ষাৎকারদাতা তাঁর শৈশবের কথা মনে করতে থাকবেন এবং আরও বেশি আলাপ চালিয়ে যেতে চাইবেন। তা করতে করতে তিনি তাঁর শাসনামলের অর্জনগুলো সম্পর্কে আরও খোলাখুলি কথা বলতে চাইবেন।

কৌশলগুলো কাজে দিয়েছিল। জেন আর আমি সাতটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমরা ভাবছিলাম তিনি হয়তো চাইবেন যে সাক্ষাৎকারের আগে আমরা যেন প্রশ্নগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে হাজির করি। কিন্তু না, তেমনটি হয়নি। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো চাইবেন যে তাঁর নিজস্ব দোভাষী আলাপের সময় উপস্থিত থাকুন (যদিও জেন এবং আমি দুজনই রুশ ভাষায় স্বচ্ছন্দ ছিলাম)। কিন্তু না, তিনি সেটিও চাননি। পুরো আলাপে তিনি ছিলেন দিলখোলা। আমি খুবই ধাক্কা খেয়েছিলাম, যখন নাকি তিনি নিজে নিজেই শৈশবে তাঁর মা যে তাঁকে নিয়মিতভাবে বেল্ট দিয়ে পেটাতেন, সেই প্রসঙ্গ তুললেন। বয়স যখন তাঁর প্রায় ১৩, তখন একদিন তিনি মায়ের হাত থেকে বেল্টটি কেড়ে নেন আর তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। বলেন, 'অনেক হয়েছে! আর নয়!' ও কথা শুনে তাঁর মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। 'আমি ছিলাম তাঁর শেষ কিছু একটা, যা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। অথচ ওই ঘটনার কারণে সেটাও শেষ হয়ে গিয়েছিল,' বলেছিলেন গর্বাচেভ।

পরে আরেক সাক্ষাৎকারে আমি এটা জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগের রাতের আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সে সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুই জানতে দেননি। প্রশ্ন করেছিলাম, জানালে কী হতো? তিনি না-ও মনোনীত হতে পারেন, এমন আশঙ্কা তাঁর স্ত্রীকে পেয়ে বসত, নাকি সফলতাকেই ভয় পেতেন তিনি? গর্বাচেভ বলেছিলেন, দ্বিতীয়টা। সেদিন রাতে ফিরে স্ত্রীকে কথাটা জানালে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কি এর সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল?' গর্বাচেভের প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁর চেয়ে তাঁর স্ত্রীকে যে বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, ওই রাতের আপত্তির সুর ছিল যেন সেসবেরই পূর্বলক্ষণ। জেন আর আমি একসঙ্গে কাজ করি, এটা দেখে তিনি সম্ভবত বেশ খুশি হতেন। স্ত্রী

রাইসার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অটুট, কিন্তু অন্য নারীদের প্রতি তাঁর সম্মানের কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। রুশ নেতাদের থেকে তিনি এ ক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। আর বর্তমান নেতার (ভ্লাদিমির পুতিন) তুলনায় তো বটেই।

আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় গর্বাচেভ থাকতেন আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও ঘরোয়া। কখনো কখনো রসিকও। যেদিন বললাম যে আমাদের মেয়ে ও তার জামাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে মস্কো আসছে, তিনি একজন সত্যিকার রাজনীতিকের মতো প্রসন্ন হাসি হেসে জানতে চেয়েছিলেন, 'ওরা কি আমার সঙ্গে ছবি তুলতে চাইবে?' আমাদের মেয়ে ফিবি তাঁর একটি একক ছবি তুলতে চাইলে তিনি তাঁর স্মৃতিকথার ছবির অনুকরণে ভঙ্গিমা করেছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর দাদুর বাগানের বর্ণনাও ওই বই থেকে পড়ে শোনান। সেখানে তিনি একটি আপেলগাছ, একটি নাশপাতিগাছ এবং অন্য একটি গাছের বিবরণ দিয়েছিলেন। শেষোক্ত গাছটি কী, তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। জেনকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু সে-ও অপারগতা জানাল। তারপর গর্বাচেভ একগাল হেসে টিপ্পনী কেটে জেনের দিকে আঙুল তাক করে বললেন, 'আর আপনি দাবি করছেন যে আপনি রুশ ভাষার একজন শিক্ষক?' পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ওই শব্দের অর্থ একজাতীয় বরই ফল।

২০০৭ থেকে শুরু করে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আমাদের বাকি সাক্ষাৎকারগুলোর প্রতিটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই ঘণ্টার। কখন সাক্ষাতের সুযোগ হবে, তার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। কখনো কখনো হঠাৎ করে তাঁর অফিস থেকে আমাদের ডাকা হতো। আমরা হন্তদন্ত হয়ে মস্কো শহরের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতাম। পৌঁছানোর পর তিনি আমাদের উষ্ণ ও আন্তরিক আলিঙ্গনে জড়াতেন। শুরুতে লেনিনগ্রাদস্তি সড়কের পাশের ভবনটির প্রায় পুরোটাতেই ছিল গর্বাচেভ ফাউন্ডেশনের অফিস। অফিসের খরচ চালিয়ে নেওয়ার জন্য ভবনটির কেবল একটি তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল একটি ব্যাংককে। ২০১৬ সাল নাগাদ অফিসটির খরচাপাতি অনেক কমিয়ে আনা হয়। দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে গর্বাচেভ যে বিপুল আয় করতেন, বয়স বেড়ে যাওয়ায় তা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে তাঁর ফাউন্ডেশনের কাজের সুযোগও দিন দিন কমে আসছিল। এরপরও তিনি তাঁর তৎকালীন ও সাবেক সহকর্মীদের সঙ্গে মস্কো ও স্টাভরোপোল শহরে আমাদের সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন। পরেরটি হলো রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর, যেখানে তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের সূচনা হয়। তাঁর জন্মস্থান প্রিভলনয়ি গ্রামেও তিনি আমাদের ঘুরে

আসার খরচ জুগিয়েছেন। তাঁর সাবেক শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কথা বলতে আমরা অবশ্য ভিন্ন পথ নিয়েছিলাম।

২০১৭ সালে যখন ইংরেজি ভাষায় আমার বইটি, *গর্বাচেভ*, প্রকাশিত হয় (রুশ অনুবাদ বাজারে আসে ২০১৮ সালে), তখন তিনি অনেক রোগা ও কমজোরি হয়ে পড়েছেন। বইয়ে আমি মূলত তাঁর প্রশংসা করে গেলেও, যেটুকু সমালোচনা করেছি, তা তাঁর অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ভেবে ভয় হচ্ছিল। এরপর জেন ও আমার সম্মানে তাঁর ফাউন্ডেশনে আয়োজিত ভোজসভায় আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলে অবাক না হয়ে পারলাম না। ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমাদের জানালেন যে ক্রেমলিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও একরকম জোর করে তিনি এই ভোজে উপস্থিত হয়েছেন। হুইলচেয়ারে বসে আসতে হয়েছে বলে গর্বাচেভ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। নড়বড়ে পায়ে তিনি কক্ষে ঢুকলেন আর আমাদের আবারও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন। অতিথিদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ভিটালি মানস্কি ও নাট্যকার আলেকজান্দার গেলমান। তাঁরা গর্বাচেভের ওপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছিলেন। পরে সেটি ২০২০ সালে *গর্বাচেভ, হেভেন* নামে মুক্তি পায়। তথ্যচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে যে তিনি একটি শৌখিন গ্রামীণ বাড়িতে, রুশিরা যাকে বলে দাচা, তাতে বাস করছেন। একজন পাচক, কয়েকজন পরিচারিকা এবং কয়েকজন ব্যক্তিগত গাড়িচালক বা দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এমন এক বাড়িতে অবস্থান করছেন, যাকে আপাতভাবে হেভেন বা স্বর্গ বলে মনে হয়। অথচ তিনি সেখানে থাকছেন পরিবার-পরিজন ছাড়া, একা। ফিল্মটিতে দেখানো হয়েছে, তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বিরক্ত, নিজের কর্ম নিয়ে গর্বিত, অথচ সেসবের ফল কী, তা নিয়ে নিজেই সন্দিহান। চোখে পড়ার মতো বিষয় হলো, গর্বাচেভের পেছনে থাকা টেলিভিশনের পর্দায় ভ্লাদিমির পুতিনের ভাষণ দেওয়ার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

গর্বাচেভ ফাউন্ডেশনে ভোজপর্ব চলার সময় নির্বাহী পরিচালক আমার কানে কানে বললেন যে আমার বইটি মিখাইল গর্বাচেভের পছন্দ হয়েছে। আমি খানিকটা লজ্জিত হয়েছিলাম। এটা ভেবে যে লোকটির কাছ থেকে নানা সাহায্য নেওয়ার বিনিময়ে তাঁকে খুশি করতে গিয়ে হয়তো আমি আমার নৈর্ব্যক্তিকতাকে শেষাবধি বিসর্জন দিয়ে ফেলেছি। আবার যে মানুষটাকে বোঝার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, তিনি যে আমাকে সফল হিসেবে বিবেচনা করেছেন, এটা জেনে বেশ তৃপ্তিও পেয়েছিলাম।

২০১৯ সালে আমার জন্মদিনে খুব ভোরে একটা ফোন পেলাম। তখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের অ্যামার্স্ট শহরের বাসায়। ফোনটি এসেছে গর্বাচেভ ফাউন্ডেশন থেকে। খানিক পরে আমি এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'বিল, কেমন চলছে?' গর্বাচেভ সচরাচর তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের যেভাবে সম্বোধন করে থাকেন, সেই স্বরেই বললেন। 'মস্কোতে কবে ফিরছেন? আর হ্যাঁ, বইয়ের কাটতি কেমন?' তিনি জানতে চাইলেন।

● **উইলিয়াম টবম্যান** *গর্বাচেভ: হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস* বইয়ের লেখক। পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী এ লেখকের অন্যতম বই হলো *খ্রুশ্চেভ: দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ এরা*।

লেখাটি যুক্তরাষ্ট্রের *পলিটিকো* পত্রিকার সাময়িকীতে ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে "গর্বাচেভ ইজ হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

সাক্ষাৎকার

জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রহীয় ব্যবস্থা না নিলে 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'

দীপেশ চক্রবর্তী

দীপেশ চক্রবর্তী (জন্ম : ১৯৪৮, কলকাতা) একজন ভারতীয় বাঙালি ইতিহাসবিদ। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসশাস্ত্রে অধ্যাপনা করছেন। ইতিহাস গবেষণায় অবদানের জন্য ২০১৪ সালে তাঁকে টয়েনবি পুরস্কার দেওয়া হয়। মূলত উত্তর উপনিবেশবাদ এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি পরিচিত। তাঁর মূল কাজগুলো ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলেও বাংলাতেও তিনি সমান পটু ও পঠিত লেখক। তাঁর *রিথিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্টরি* বইটি কলকাতার পাটকলশ্রমিকদের আন্দোলনের যে পর্যালোচনা হাজির করে, তা শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি—এই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ইউরোপকেন্দ্রিক আধুনিকতা ও সভ্যতার ধারণাকে বিচার করে দেখান তাঁর *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ* বইয়ে। সাবলটার্ন স্টাডিজ নামে খ্যাত ইতিহাসচর্চার ধারা থেকে সরে তিনি এখন প্ল্যানেটারি ইতিহাস বা গ্রহীয়-ইতিহাস চিন্তা নিয়ে কাজ করছেন। এর প্রেক্ষিত হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও অতিমারি। মানুষ একসময় সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বদলাত, এখন তারা পৃথিবী নামক গ্রহের জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতাই বদলে দিচ্ছে। দীপেশ গ্রহীয় কর্তাশক্তি হিসেবে মানুষের ভূমিকার পর্যালোচনা করেছেন এ সাক্ষাৎকারে।

*প্রতিচিন্তা*র জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **সারোয়ার তুষার**

সারোয়ার তুষার : মানব-প্রজাতির লাগামছাড়া আত্মকেন্দ্রিকতায় আজ পৃথিবী নামক গ্রহটা বিপন্ন। আমাদের সভ্যতাই জলবায়ু ও অতিমারির সংকট তৈরি করে বিপদ ডেকে আনছে। সামাজিক বিজ্ঞান এবং নানাবিধ মানবিক বিদ্যা খুব একটা আমলে না নিলেও আপনার ভাষায় এই শাস্ত্রগুলো 'environmentally blind' (Chakrabarty 2021a)—জলবায়ু সংকট ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আলাপ

যে একেবারে ছিল না, তা নয়। কিন্তু প্ল্যানেটারি যুগে এই জলবায়ু সংকট, অতিমারি ইত্যাদিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন দার্শনিকতা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ইতিহাসবোধ নিয়ে দেখার জরুরত হাজির হয়েছে। সুতরাং সবচেয়ে অবধারিত প্রশ্নটা দিয়েই এই আলোচনাটা শুরু করা যাক। 'প্ল্যানেটারি' ক্যাটাগরিটার মানে কী? কীভাবে আমরা একটা 'প্ল্যানেটারি যুগ'-এ এসে পৌঁছালাম?

দীপেশ চক্রবর্তী : উত্তর-ঔপনিবেশিক আলোচনায় পরিবেশ নিয়ে বিশেষ কথা উঠত না—গত শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে এডওয়ার্ড সাঈদ, গায়ত্রী স্পিভাক, হোমি ভাবা, অর্জুন আপ্পাদুরাই প্রমুখের লেখার কথা বলেছি। সেখানে ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষমতার সম্পর্ক, বর্ণবিদ্বেষ, লিঙ্গ বা জাতিভেদ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সম্পর্ক বা রিশতা, ভাষা, সাহিত্য, মতাদর্শে এই সব সম্পর্ক কীভাবে জড়িয়ে যায়, তা নিয়ে আলোচনা হতো। আমাদের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এ আমরা কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহের প্রশ্নে আগ্রহী ছিলাম, ধনতন্ত্র বিষয়েও। কিন্তু একটি সংখ্যায় রামচন্দ্র গুহর একটি প্রবন্ধ ছাড়া পরিবেশ নিয়ে আর কিছু ছাপা হয়নি। তখন 'পরিবেশবিদ্যা' ও 'পরিবেশের ইতিহাস' এই সব কথা চালু হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ভাবনায় তা আসত না। আমরা ভাবতাম সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রের তত্ত্ব দিয়েই ওই সব জিনিসের ব্যাখ্যা চলে, নতুন করে কিছু ভাবার নেই। বরং গ্লোবাল দুনিয়ার তত্ত্ব, যা নিয়ে আপ্পাদুরাই লিখছিলেন, তা আমাদের বেশি ভাবাত। তখন অনেকেই 'গ্লোবাল ক্যাপিটাল'-এর চরিত্র নির্ধারণ করতে ব্যস্ত। মাইকেল হার্ট (Hardt) আর টোনি নেগ্রির বিখ্যাত বই *এম্পায়ার* (২০০০) দেখো : ধনতন্ত্র, অভিবাসী মানুষ, নতুন রাজনৈতিক ব্লক 'দ্য মাল্টিচ্যুড'—এই সবের কথা আছে। কিন্তু পরিবেশগত সংকটের সিরিয়াস আলোচনা অনুপস্থিত। রব নিক্সন প্রথম উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশের আলোচনা তোলেন, ২০১১ সাল নাগাদ। অথচ ভাবো, ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আন্তসরকারি প্যানেল তৈরি করেছে, ১৯৯০-এর গোড়ায় বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে কাগজে কথা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সে বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। এই অনাগ্রহকেই আমি সাময়িক অন্ধতা বলেছি। আমরা ভাবতাম গ্লোবাল যুগের আগমনই শেষ কথা।

নাসা প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা কিন্তু ১৯৮০-এর প্রথমার্ধেই নতুন এক মিশ্র-বিজ্ঞানের শাখার জন্ম দিয়েছেন। তার নাম Earth System Science বা সংক্ষেপে ESS। এখন অনেকে এই নামে ভূতত্ত্বকেই ডাকেন। এই বিজ্ঞানীরাই দেখাতে শুরু করেন যে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে এবং এই

বৃদ্ধি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে শুধু ক্ষতিকর নয়, বিপজ্জনকও। পৃথিবী নামক গ্রহটিতে প্রাণের ইতিহাস ও গ্রহের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পরস্পর জড়িত বলে, তাপমাত্রা খুব বাড়লে সমুদ্র শুধু বহরেই বাড়বে না, তার লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে নানান প্রাণী ষষ্ঠ মহাবিলুপ্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। আজ মানুষের কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বাড়ার ফলে পৃথিবীজুড়ে যেসব পরিবেশগত সংকট প্রকটিত হয়েছে, এই অতিমারিও তার মধ্যে পড়ে, তা নিয়েও সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, এমনকি যাঁরা উচ্চশিক্ষিত নন, তাঁরাও আজ আগের চেয়ে বেশি ভাবিত। যুগটা আর শুধু 'গ্লোবাল' নয়, পৃথিবী নামক এই গ্রহে নানাবিধ প্রাণ কীভাবে, কোন সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে একসঙ্গে বেঁচে থাকে, তাই নিয়ে অবিশেষজ্ঞ মহলেও কথা ওঠে। তাই এটা একটা প্ল্যানেটারি যুগও বটে।

সারোয়ার তুষার : হাল আমলে জলবায়ু সংকট, অতিমারি ও সার্বিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের বাস্তবতায় মনুষ্যকেন্দ্রিক প্রগতিবাদী চিন্তার নানা রকম সমালোচনা হচ্ছে। প্ল্যানেটারি—যাকে আমি বাংলা করেছি গ্রহীয়—দৃষ্টিকোণ থেকে 'মানুষ' কথাটার তাৎপর্য কী? প্ল্যানেটারি ইতিহাসে মানুষের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে (decenter of human)—এই কথার মানেই-বা কী?

দীপেশ চক্রবর্তী : ঠিকই তো, আলোকপ্রাপ্তির যুগে মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষের স্বাধীনতা—এই সব কথা উঠেছিল এবং নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তকদের প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপীয় চিন্তা থেকে আমরা ভারতীয় ভূখণ্ডে যে দুটি প্রধান ভাবধারাকে নিজের করে নিয়েছি, তা হলো মার্ক্সবাদ ও উদারনীতিবাদ বা লিবারেলিজম। দুটিরই মূল চিন্তা মানুষের স্বাধীনতা বা মুক্তি। দুই ধরনের মুক্তি : ১. মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার থেকে মুক্তি এবং ২. প্রাকৃতিক শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি। এই দুটি দর্শনের আওতায় থেকে আমরা যেসব ইতিহাস লিখি বা কল্পনা করি, সেসব কাহিনির কেন্দ্রে থাকে মানুষ। মানুষই এই সব আখ্যানের নায়ক। তার শ্রেণিসংগ্রাম, সামাজিক ন্যায়ের জন্য তার লড়াই, মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার—এই ধরনের গল্প আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। একেই মনুষ্যকেন্দ্রিক চিন্তা বলি।

কিন্তু আর্থ সিস্টেম সায়েন্স, তাকে আমরা তোমার ভাষায় এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় 'গ্রহবিজ্ঞান' যদি বলি, তার মূল ভিত্তি হলো গ্রহটির ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং এই গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস। এই দুটি ইতিহাস আবার পরস্পর জড়িত। প্রাণ পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক চেহারাকে প্রভাবিত করে। যেমন প্রাণ আছে

বলে এই গ্রহে অনেক পরিমাণ অক্সিজেন আছে। আবার অক্সিজেন আছে বলে অন্যান্য পাথুরে গ্রহের তুলনায় এখানে খনিজ পদার্থের বৈচিত্র্য বেশি। আবার ভূতাত্ত্বিক চরিত্রও প্রাণের ইতিহাসকে গতি দেয়; যেমন গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ঠিক মাত্রায় না থাকলেও প্রাণের সংকট হয়। কিন্তু পৃথিবীর এই দুটি ইতিহাসেই—ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাস—মানুষ এত পরে এসেছে যে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে এই গল্পগুলো বলা যায় না। অথচ মনুষ্য প্রজাতির ইতিহাস, প্রাণের বিবর্তন ইত্যাদি কাহিনিকে ভিন্ন ভিন্নও বলা যায় না। তাই গ্রহীয় ইতিহাসে মানুষ কেন্দ্রচ্যুত।

সারোয়ার তুষার : আপনি লিখেছেন, মানুষ একদিক থেকে 'মানুষ', আবার অন্যদিক থেকে 'না-মানুষ'ও বটে (দীপেশ ২০২১)। কিন্তু মানুষের যে অধিকার-চিন্তা এবং সেটাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনীতি; এতে তো মানুষকে গোটা জীব ও জড়জগৎ থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবা হয়। তাহলে মানুষকে 'না-মানুষ' তথা জীব-প্রজাতির অংশ ধরে নিয়ে কোনো 'রাজনীতি ' কল্পনা করা কি সম্ভব? এই প্রসঙ্গেই জানতে চাই, 'provincializing the political' বলতে আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?

দীপেশ চক্রবর্তী : মানুষ যে না-মানুষও বটে, এটা এখন সর্বজনগ্রাহ্য। বিবর্তনের বিচারে আমরা জন্তুবিশেষ, শিম্পাঞ্জিদের নিকটাত্মীয়। আবার যদি মাইক্রোবায়মের কথা ধরো, তোমার-আমার শরীর যে কেবল কোটি কোটি জীবাণুর কলোনি তাই নয়, তারা তোমার-আমার শরীরের ভেতরে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, সেই প্রক্রিয়াগুলো না থাকলে নাকি আমাদের অনেক মুড, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হতো না। ওদিকে আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণীভুক্তও বটে, তা না হলে তো কোনো জন্তুর শরীরে মানুষের রোগের ওষুধ পরীক্ষা করার প্রশ্ন উঠত না। ফলে মানুষের সভ্যতার বাড়বাড়ন্তের ফলে অন্য প্রাণীর প্রাণ যতই ওষ্ঠাগত হয়েছে, বেশ কিছু দার্শনিক ততই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটা এই যে ন্যায়ের বিভিন্ন প্রশ্নের আওতায় ও রাজনীতির অঙ্গনে না-মানুষ প্রাণী ও অ-প্রাণী (যেমন পাহাড় বা নদী, যা নানান প্রাণীর প্রয়োজন) নিয়ে আসা উচিত কি না। লাতোর সাহেব 'parliament of things' বলে একটা কিছু কল্পনা করে আমাদের ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন। মনুষ্যকেন্দ্রিক রাজনৈতিক যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তা সে রাষ্ট্রই বলো, বিচারব্যবস্থা বলো, আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘ বা রাষ্ট্রপুঞ্জ যা-ই বলো, এই সব প্রতিষ্ঠানকে কোনো দিন জন্তু-জানোয়ারের, সামুদ্রিক প্রাণীর, কীটপতঙ্গের, গাছগাছালির, অরণ্যের, পাহাড়-নদী-বাতাসের বা চোখে দেখা

যায় না যাদের, সেই সব ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে? যখন আমি আমার বই, *The Climate of History in a Planetary Age* (2021)-এর কাজ করতাম, তখন আমি ভাবতাম যে হয়তো কোনো দিন লাতোরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যাবে, শুধু আমরা এখনো জানি না হয়তোবা লাতোরও জানতেন না—কীভাবে। কিন্তু এই বাস্তবায়ন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কীভাবে? রাজনীতির জগৎটা প্রসারিত হয়ে কোনো দিন এমন একটা ব্যবস্থা হতে পারে ভাবতাম, যেখানে না-মানুষেরও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মনে রেখো, বিশেষজ্ঞরা যেভাবে গাছ বা মাছ বা হিমশৈলের স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলতে পারেন, তার কথা বলছি না, সেটা তো আছেই এবং সে রকম ব্যবস্থা কিছু কিছু করে কোনো কোনো দেশে হচ্ছেও। সেইভাবে আমরা নদী বা গাছের অধিকারের কথা বলছি। কিন্তু এঁরা প্রশ্ন তুলছিলেন রাজনীতিটাই এমন হতে পারে কি না, যেখানে মানুষের মধ্যস্থতা ছাড়াই না-মানুষের অধিকার থাকতে পারে। অর্থাৎ রাজনীতি বলতে যা বুঝি তার একটা আমূল পরিবর্তন।

এখন আমার মনে হয়, মানুষের অভিজ্ঞতার অনেক অনতিক্রম্য সীমা আছে। অন্তত এখনো অনতিক্রম্য। আমরা অণুজীব চোখে দেখতে পাই না অথচ জীবজগতে তারাই সংখ্যায় বেশি। আমরা অনেক গাছের চেয়ে, অনেক জন্তুর চেয়ে কম বাঁচি। আমাদের সময়চেতনা আমাদের এই আয়ুর সময়ের ওপর নির্ভর করে। এই সব নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান সব সৃষ্টি হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করে সব না-মানুষকে সমভাবে এর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সেই অর্থে বলেছিলাম, রাজনীতি বলতে আমরা যা বুঝি, তা হয়তো নিতান্তই মানুষেরই—সেই অর্থে জীবজগতে রাজনীতি সর্বজনীন কিছু নয় (এই কথা বলে আমি মানুষের সব কর্মে বায়োলজিক্যাল বিবর্তনের যা প্রভাব তাকে অস্বীকার করছি না)। জীবজগতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের একটি parochial বা সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্য। সেই একই পরিপ্রেক্ষিতে সে provincial বা আঞ্চলিকও।

সারোয়ার তুষার : কোনো একটা আলোচনায় আপনি বলেছিলেন, 'The personal is planetary'। আমরা তো 'personal is political' এভাবে ভেবে অভ্যস্ত। কিন্তু 'personal is planetary' কথাটার অন্তর্নিহিত সারবস্তু কী?

দীপেশ চক্রবর্তী : সারবস্তু নানাভাবে বোঝার চেষ্টা করা যায়। পেট্রল-ডিজেল খরচা করে যেসব দৈনন্দিন বাহন আমরা নিত্য ব্যবহার করি, সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত কর্ম এখন যে প্ল্যানেটারি গরমিতে ইন্ধন দেয়, সে তো আমরা জানি। কিন্তু অন্য

একটা অর্থেও আমরা এই গ্রহের ও গ্রহের প্রাণের ইতিহাসের ফসল। এমনকি তুমি যাকে ভয়ংকরভাবে ব্যক্তিগত মনে করো হয়তো, সেই শরীরের কথাই ভাবো। তোমার অনেক শারীরিক-মানসিক অভিজ্ঞতা আছে, যা একান্তই তোমার। কিন্তু তোমার এই শরীর ডিজাইন করতে গ্রহটির কয়েক কোটি বছর লেগেছে। নানান শরীর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষের শরীর হয়েছে। তোমার যা কিছু অনুভব করার ক্ষমতা আছে, সে প্রেমানুভূতিই হোক বা ঈশ্বরানুভূতিই হোক—সেই সব ক্ষমতার বিকাশ। তুমি যদি বিবর্তনের তত্ত্বে ভরসা রাখো, তাহলে তুমি কিন্তু গ্রহীয় ইতিহাসের অংশ। আমাদের শরীর যদি আমার অর্থে প্ল্যানেটারি না হতো, তাহলে চিকিৎসাশাস্ত্র গড়ে উঠত না। ওষুধ যে আমরা বানাই, তা কি এই শরীরের সঙ্গে জৈব ও অজৈব পৃথিবীর যে বহুকালের সম্পর্ক, তার কথাই বলে না? আমার কথাটা আসলে নানান দিক থেকে ভাবা যায়।

সারোয়ার তুষার : আপনারা যখন পোস্টকলোনিয়াল ফ্রেমে জাস্টিস, ইকুয়ালিটি ইত্যাদির কথা ভাবছিলেন; তখন আপনারা 'একটাই বিশ্ব' এই ইউরোপীয় দাবির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নানাবিধ 'difference'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। *Provincializing Europe* বইটার উপশিরোনামেই 'historical difference' কথাটা আছে। এখন কিন্তু আবার আপনাকে বলতে হচ্ছে জলবায়ু সংকট, অতিমারি ইত্যাদির ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার একটা ঐক্য তৈরি হচ্ছে। এই যে 'difference' থেকে শুরু করে 'oneness'-এ এসে পৌঁছানো, এই দোলাচল নিয়ে মানুষের করণীয় কী?

দীপেশ চক্রবর্তী : এই প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি একটি ছোট বই শেষ করলাম, নাম *One Planet, Many Worlds* (যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিতব্য)। মানুষের এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র সরাসরি মেটানোর কোনো উপায় নেই। মানুষ তার ইতিহাসের শুরু থেকেই ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আবার এটাও ঠিক যে মানুষের অন্য মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করার ক্ষমতা আছে, তা ছাড়া কোনো নেশন-স্টেট হতো না। কিন্তু একত্র হওয়ার প্রতিটি স্তরেই মানুষের নানান বিভেদ দেখা দেয়। উল্টো দিকে, পৃথিবীর গ্রহবিজ্ঞান গ্রহটিকে একটি 'সিস্টেম' বলে ধরে মানুষের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার শেষ করার জন্য সাধারণ ও সর্বজনীন একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে; কিন্তু মানুষ তার সামাজিক, ঐতিহাসিক নানান বিভেদের জন্য এই IPCC-(জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় আন্তর্জাতিক প্যানেল) প্রদত্ত ক্যালেন্ডারের দিন অনুযায়ী কাজ করে উঠতে পারে না। এর ব্যবহারিক অর্থ এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রহীয় সমস্যা

থেকে আমরা যেকোনো এক বিশেষ দিনে মুক্তি পাব, তা মনে হয় না। সমস্যা আরও ঘনীভূত হবে, ফলে ইংরেজিতে যাকে climate mitigation বলে, শুধু তার কথা না ভেবে adaptation-এর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। আসলে, মানুষকে তার প্রভেদ ভুলে কাজ করতে বলে এমন কোনো সমস্যা মানুষের ইতিহাসে আগে আসেনি। আমরা প্রভেদের ভেতর দিয়েই কাজ করি। ফলে historical difference, যা নিয়ে *Provincializing Europe* লিখেছিলাম, তার থেকে মানুষের মুক্তি আছে বলে মনে হয় না। আমাদের একটি প্রজাতি হিসেবে যে একত্ব, তা pre-political, আর যা পলিটিক্যাল, তার ভিত্তি হলো ভেদবুদ্ধি (অনেক সময় সেই বুদ্ধি ন্যায়ের পক্ষে, তা অস্বীকার করি না)। মানুষকে তো আগে কোনো দিন ভাবতে হয়নি যে একটা গ্রহের সমস্যা তার নিজের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাটাই অভূতপূর্ব। সেখানে আমাদেরও দেখতে হবে মানুষ কী করে। তা থেকে মানুষের সম্বন্ধেই আরও শিখব।

সারোয়ার তুষার : অমিতাভ ঘোষ এক রকমের আক্ষেপের সুরেই বলেছেন যে সাহিত্যে পৃথিবীর এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সংকটের—অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন—কোনো চিহ্ন নেই (Ghosh 2016)। দুই স্তরে প্রশ্ন রাখতে চাই : এই আধুনিকতার কোনো 'revisionist' ডিসকোর্স কি তৈরি করা সম্ভব, যা জলবায়ু সংবেদনশীল হবে? নাকি সম্পূর্ণ নতুন প্যারাডাইম বা চিন্তাকাঠামোই খুঁজতে হবে? দ্বিতীয়ত, সমাজবিদ্যা, মানবিক বিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য ঘরানার মানুষেরা কেন ক্লাইমেট প্রশ্নে উদাসীন? এর কি কোনো ঐতিহাসিক কারণ আছে, যা খোদ এই জ্ঞানকাণ্ডগুলোর ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত?

দীপেশ চক্রবর্তী : ক্লাইমেটের প্রশ্নে পশ্চিমা দুনিয়া যত ভাবে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কথা বাদ দাও, তাদের নানান দৈনন্দিন বাঁচার সমস্যা; আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও ততটা ভাবেন না, তাঁরা মোটামুটি উদাসীন। অথচ সমস্ত বিজ্ঞানই বলে ক্ষতি হবে গরিব মানুষেরই বেশি। এই উদাসীনতার মূল কারণটা আমি জানি না। যে আগ্রহ নেই, তা নিয়ে দুঃখ করা যায়, কিন্তু তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত। তবে আমিও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি। আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা মনে হয় বলি। পশ্চিম ৫০০ বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করে 'পৃথিবী'র তথা 'সর্বজনীন' সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য অনেক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি ইত্যাদি তৈরি করেছে। তার সেই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) এখনো লুপ্ত হয়নি। আমরা সেই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জন করেছি খুব আংশিকভাবে। গোটা উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ঔপনিবেশিক

ও আধুনিকতার কথা মনে করলে, সেই ইতিহাসে আমার মাত্র দুজন মানুষের কথাই মনে পড়ে, যাঁরা (ধার্মিক চিন্তার বাইরে গিয়ে) সব মানুষের জন্য ভাবতেন : গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের কাছে নিছক একজন বাঙালি কবিতে পর্যবসিত হয়ে আছেন। কেবল গান্ধীজিই আজও, সব সমালোচনা সত্ত্বেও একজন সর্বজনীন চিন্তার মানুষ। এঁদের বাদ দিলে আমাদের বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীর সব সর্বজনীন চিন্তা ওই সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন নিয়েই। সেই প্রশ্ন ঘিরেই আমাদের রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ও উত্তেজনা। আমাদের এমন কোনো বুদ্ধিজীবী নেই, যিনি ভূতত্ত্ব, evolutionary biology, atmospheric chemistry, systems theory, thermodynamics দিয়ে আমাদের মানুষ, সমাজ ইত্যাদি নতুন করে ভাবতে শেখাবেন। অত দূরেও যেতে হবে না, এমনকি লাতোরের কথাও বাদ দাও, আমাদের সমাজচিন্তায় Deleuze-এরই বা কী প্রভাব? অথচ Deleuze ছাড়া লাতোরের কাজ ভাবা যায় না। আমাদের বেশির ভাগ চিন্তকই পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত, অন্তত আমি যাঁদের কাছ থেকে শিখি, জানি, তাঁরা—তাঁরা কিন্তু ওই একটি পরিচিত জানালা দিয়েই পৃথিবীকে দেখেন। আমি একজন খুব সামান্য মানুষ। পশ্চিমের কোনো কোনো দিককে জীবনে গভীরভাবে গ্রহণ না করলে, আমিও হয়তো এই সব নিয়ে যেটুকু ভেবেছি, তা-ও ভাবতাম না। নিজের প্রশংসা করছি ভাবলে আমাকে ভুল বুঝবে। বাংলাদেশের ফারুক ওয়াসিফ একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'দীপেশদা, আপনে কিন্তু সাদা হয়া গেছেন।' ঠাট্টা হলেও কথাটার মধ্যে একটা সত্য ছিল। তা ছাড়া আমি অনেক ভুল করতে করতে শিখি। আমার এইটাই মনে হয় : আমাদের যে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও মানুষের অধিকারবোধে, ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে আগ্রহ, তা খুবই ভালো। কিন্তু বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যায় আমাদের যে অনাগ্রহ, তাকে আমার আমাদের শিক্ষার-প্রাতিষ্ঠানিক জগতের কোনো একটা খামতির দিকের চিহ্ন বলেই মনে হয়।

সারোয়ার তুষার : আপনি লিখেছেন যে জৈব-ক্ষমতার (bio-power) intensification খোদ জৈব-ক্ষমতারই একটা সংকট ডেকে এনেছে (Chakrabarty 2021b)। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে প্রকৃতিকে যেভাবে অবাধ নিষ্কাশনের ক্ষেত্র ধরে নেওয়া হয়েছিল, তা মানুষের জীবনের জন্যই বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন...

দীপেশ চক্রবর্তী : এটার উত্তরটা সহজ। মানুষের হাতে যখন অনেক সস্তায় অনেক শক্তি (ফসিল ফুয়েল থেকে হৃত এনার্জি) ব্যবহারের উপায় এল, তখন মানুষের কী হলো? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, জনস্বাস্থ্যনীতির 'উন্নতি' হয়ে মানুষের সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পেল, বিশ শতকে প্রায় চার গুণ—মানুষের গড়পড়তা আয়ু বাড়ল, ধন বৃদ্ধি হলো, গত শতাব্দীতে ফসল ফলানোয় সবুজ বিপ্লব ঘটে গেল, বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন মানুষ শিগগিরই অমর হবে। মনে হলো, পৃথিবীতে আগের চেয়ে বেশি শান্তি এসেছে এবং মানুষের জীবন অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়েছে। তার ওপর সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন হলে অনেকে ভাবলেন এবার গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। সব মিলিয়ে মনে হলো জৈব-ক্ষমতার জয়জয়কার। মনে হলো, এত মানুষ এত দিন এত ভালোভাবে আগে আর কখনো ইতিহাসে বাঁচেনি। স্টিভ পিঙ্কার সাহেবের বই সব পড়ে দেখো। কিন্তু এরই ফলে এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে মানুষেরই নতুন আপৎ তৈরি হলো, যাকে আমরা জলবায়ু-পরিবর্তন বলি। এখন তো ঠিকমতো ব্যবস্থা না নিলে 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'।

সারোয়ার তুষার : 'এজেন্সি' ক্যাটাগরিটা নিয়ে প্ল্যানেটারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজকাল নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সাবলটার্ন স্টাডিজে আপনারা যখন 'এজেন্সি' বা ক্রিয়াকারী কর্তাসত্তার প্রশ্নটাকে মোকাবিলা করছিলেন, তখন আপনারা আসলে ব্যক্তি-মানুষের কর্তাসত্তা, সার্বভৌমত্বের পক্ষে সওয়াল-জবাব করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তো মানুষের কালেক্টিভ এজেন্সির প্রশ্নটাও হাজির হয়েছে। আশিল এমবেম্বে তাঁর *Out Of the Dark Night* (2021) বইয়ে এর কথা লিখেছেন। নতুন এই এজেন্সির ধারণাকে আমাদের চিন্তায় জায়গা করে দিলে, তা আমাদের চিন্তাবিশ্বের কেমন পরিবর্তন ঘটাতে পারে? আমরা কি আগের মতো ভাবতে পারব?

দীপেশ চক্রবর্তী : এমবেম্বের সঙ্গে আমি একমত। ১৯৮০ ও ৯০-এর সময়টা আমাদের পক্ষেও মজার ছিল। আমরা যখন ষাট আর সত্তরের দশক থেকে বেরিয়ে কৃষককে তার ইতিহাসের 'মেকার' হিসেবে ভাবার চেষ্টা করছি, তখনই গায়ত্রী-হোমিরা ফুকো-দেরিদা-লাকাঁর প্রভাবে ইতিহাসের কর্তাসত্তার ধারণাটিকে সমালোচনা করে বামপন্থাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তখন ফুকোর সঙ্গে গ্রামসির, দেরিদার সঙ্গে মার্ক্সের কীভাবে মেলবন্ধন ঘটানো যায়, এই সব চিন্তা চলছে। গায়ত্রী বলছেন, আমাদের সাবলটার্ন স্টাডিজে এজেন্সি বা কর্তাসত্তার ধারণাটি অতি সরল। হোমিরও এজেন্সি নিয়ে ধারণায় লাকাঁর প্রভাব লক্ষণীয়।

ফলে ওঁরা তখন খানিকটা পোস্ট-মডার্ন আর আমরা যেন মডার্নিটির সীমানা ছাড়িয়ে ওঁদের ধরার, বোঝার চেষ্টা করছি। এরই মধ্যে আশিস নন্দী এসে গেলেন, আমরাও দ্যলুজ-ফুকো-দেরিদা-লাকাঁ পড়ে নিৎসে, হাইডেগার ইত্যাদি পড়ার দিকে ঝুঁকেছি। কেমন একটা মডার্ন আর পোস্ট-মডার্নের মাঝামাঝি আমাদের অবস্থান। গান্ধীকে পছন্দ করি, আবার আমরা মাওবাদীও বটে। অধিকার, সার্বভৌমত্ব, কর্তাসত্তা, বিপ্লব, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ধারণা ছাড়তেও পারি না, আবার এগুলোর যে সত্যিই কোনো ভিত্তি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। গায়ত্রী এসে 'strategic essentialism'-এর কথা তুলে এই সন্দেহের একটা নিরসন করলেন বটে, কিন্তু সে ছিল খুবই সাময়িক (কোনটা strategic আর কোনটা opportunist, তা কি ভবিষ্যৎ ছাড়া কেউ বলতে পারে?)।

এই সব দোলাচলের মধ্যে একদিন শুনলাম মানুষ নাকি একটা বিশাল এক গ্রহীয় বল বা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে তার প্রযুক্তিনির্ভর এই সভ্যতা দিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে দিতে পারে, প্রাণের মহাবিলুপ্তি ঘটাতে পারে, আগামী বরফের যুগ পিছিয়ে দিতে পারে। সে একটা জিওলজিক্যাল এজেন্ট। 'এজেন্ট' কথাটায় একটা নতুন মাত্রা যোগ হলো। এই নিয়ে অবশ্য সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে খুব তর্কও হলো—'মানুষ' না ধনতন্ত্র? নাকি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ও উন্নয়ন?

এই তর্কগুলো চলবে। কিন্তু কতগুলো কথা বোঝা দরকার। এখানে 'এজেন্সি' কথাটা ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। আমি যদি কেবল মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মানুষের পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা তা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমার কাহিনির নায়ক মানুষ, আর খলনায়ক ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হোতারা। এই দ্বিতীয় পক্ষের বেশির ভাগই সাদা মানুষ, যদিও সবাই নন। আবার আমি যদি মনে করি যে শুধু মানুষ আর বাতাসের গল্প তো এই জলবায়ু পরিবর্তনের কাহিনি নয়, গ্রহটির অনেক প্রাচীন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেমন কার্বন সাইকেল, নাইট্রোজেন সাইকেল, হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল—মানুষের চাহিদা ও জীবন জড়িয়ে যাচ্ছে, তখন কার্যকারণ সম্পর্ক অনেক জটিল হয়ে যায়। যাঁরা বামপন্থী, তাঁরা মনে করেন এই সমস্যার একটা 'final cause' আছে, সেটা ধনতন্ত্র। তাই তাঁরা Capitalocene-এর কথা বলেন। আবার যাঁরা complexity-এর তত্ত্ব দিয়ে সমস্যাটিকে বোঝার চেষ্টা করবেন, তাঁরা হয়তো দেখবেন নানান কারণ—ধনতন্ত্র তার মধ্যে একটি বড় বিষয় কিন্তু একমাত্র বড় বিষয় নয়। মানুষের সংসার গত এক শ বছরে খুব দ্রুত ও অভূতপূর্ব গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর ওপরে মানুষের দাবি বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার

সময়ে অখণ্ড ভারতের জনসংখ্যা যা ছিল, আমার জীবৎকালে শুধু ইন্ডিয়ার জনসংখ্যাই তার চার গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এরই মধ্যে আমরা আরও বেশি করে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনেছি, ব্যক্তি মানুষ থোড়াই সার্বভৌম এক সত্তা; তার গোটা শরীরটাই হলো কোটি কোটি অণুজীবের বাসস্থান। আধুনিক সমাজে তুমি গাড়ি চালিয়ে কাউকে ধাক্কা মারলে তোমাকে সার্বভৌম ধরে জজ সাহেব সাজা দেবেন। কিন্তু তোমার পেটে আলসার হলে ডাক্তার দেখবে তোমার পেটে কোন ব্যাকটেরিয়ার বাস। সেই ব্যাকটেরিয়া তো আর তোমার দাস নয়, তখন তোমার সার্বভৌমত্ব কই? ওই সার্বভৌমত্ব একটা আংশিক গপ্পো, সপ্তদশ শতকের ফসল। এই সব কারণে মানুষের 'এজেন্সি', 'দায়িত্ব' ইত্যাদি প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

সারোয়ার তুষার : জলবায়ু সংকটের বাস্তবতায় মানুষ এখন একই সঙ্গে দুই ধরনের অস্তিত্বের মোহনায় দণ্ডায়মান। একদিকে [সামষ্টিকভাবে] সে ভূতাত্ত্বিক ক্ষমতা, অন্যদিকে সে পলিটিক্যাল এজেন্ট। আপনি মনে করেন, মানুষ ধারণাটারও পোস্টকলোনিয়াল চিন্তাকে ছাপিয়ে নতুনভাবে ভাবা দরকার।

দীপেশ চক্রবর্তী : আমার কাছে গ্লোব ও গ্রহ দুটি পরিপ্রেক্ষিতের নাম। আমি বলি মানুষকে এখন তার নিজেকে দুই পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবতে হবে। গ্লোব বলতে যেসব প্রযুক্তি দিয়ে মানুষ এই গ্রহকে নানান বন্ধনে তার নিজের জন্য বেঁধে ফেলেছে, সেই গোলক। এর বয়স হরেদরে পাঁচ শ বছর। আর গ্রহ হলো পৃথিবীর প্রাণের ইতিহাসে মানুষের স্থান নিয়ে। এখানে যেসব প্রক্রিয়া প্রাণ এবং মানুষকে প্রজাতি হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে, তার বয়স মানুষের প্রজাতিগত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। এই যে বাতাসে আমরা প্রাণভরে নিশ্বাস নিই, তাতে অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখার বিরাট ভূমিকা সামুদ্রিক জীব ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের। এরা বাতাসের অক্সিজেনের সিংহভাগ জোগায়, যে অক্সিজেন ছাড়া আমাদের চলে না। কত বছর ধরে জোগায় জানো? ৪০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৪০ কোটি বছর ধরে। মানুষের তো বয়স তিন লাখ বছর। এখন, মানুষি ইতিহাসের মধ্যে নিশ্চয়ই ন্যায় বা ইনসাফের কথা ওঠে। তা ছাড়া সেই ইতিহাস ভাবাই যায় না। কিন্তু বুড়ি পৃথিবী আমাদের ধারণ করলেও প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসে ন্যায় বলে কিছু নেই। আমরা না এলেও বাতাসে অক্সিজেন থাকত, তা নইলে অন্যান্য অক্সিজেননির্ভর প্রাণ বাঁচত না। আমরা গেলেও থাকবে।

গ্রহবিজ্ঞান আমাদের বলে কোটি কোটি বছর ধরে প্রাণের যে আয়োজন পৃথিবীতে হয়েছে, তাতে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে, জৈব অজৈবের সঙ্গে,

সব জড়িয়ে থাকে। সেই শিক্ষা না নিয়ে পৃথিবীর কাছে শুধু অন্ধভাবে দাবি করে গেলে যে মানুষেরই অস্তিত্বের সংকট হয়, বর্তমান সময় কি সেটাই দেখায় না? তাই সময় হয়েছে পৃথিবী-সম্বন্ধীয় গ্রহবিজ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের ন্যায়সন্ধানী ইতিহাসের মধ্যেই একটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার। ফলে বলতে পারো, পোস্টকলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রয়োজন, তারই সঙ্গে প্রয়োজন এই বড় ক্যানভাসে মানুষকে দেখা। নইলে বর্তমান সংকটের চরিত্র বা গভীরতা বুঝতে পারব না।

সারোয়ার তুষার : ব্রুনো লাতোরের সঙ্গে আপনার আলাপচারিতার শিরোনামটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ 'The global reveals the planetary' (Chakrabarty 2021a)। হতে চাইলাম 'গ্লোবাল', কিন্তু তা হতে গিয়ে প্ল্যানেটারির মুখোমুখি হয়ে গেলাম। গ্লোবাল যদি প্ল্যানেটারির উন্মোচন ঘটিয়েই থাকে, আমরা এ-ও বলতে পারি কি না : The emergence of the planetary endangers the global? বিশেষত, ষষ্ঠ মহাবিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্ল্যানেটারির আবির্ভাব মনুষ্যকেন্দ্রিক গ্লোবাল দুনিয়ার অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলছে কি না?

দীপেশ চক্রবর্তী : সে তো অবশ্যই। বলতে পারো, আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক-ঐতিহাসিক কল্পনায় একবার 'গ্রহ' একটি সমস্যা হিসেবে এসে পড়লে তখন গ্লোবালই গ্রহীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে চায়! এই যে এত climate engineering, geo-engineering নিয়ে গবেষণা চলছে, আলোচনা হচ্ছে, এ কি গ্লোবালের অন্তিম সময়ের ঘোষণা নয়? আমরা প্ল্যানেটারি যুগের দিকে চলেছি। অনেক বিজ্ঞানী এতে ভয় পান, অনেকে সমর্থন করেন। যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদের বক্তব্য, মানুষ নিজের জীবন এমনভাবে গ্রহীয় করে তুলেছে যে তাকে এখন গ্রহটিরই দায়িত্ব নিতে হবে। যাঁরা ভয় পান, তাঁরা বলেন এতে মানুষের সর্বনাশ। মানুষের যাওয়া উচিত অন্য প্রাণীদের কাছে, আবার নতুন করে শিখতে যে কীভাবে বাঁচা উচিত। অন্য প্রাণীদের অন্ধ নকল নয়, তাদের জীবন পরীক্ষা করে মূল মন্ত্রগুলো শেখা। তাঁরা বলেন, মানুষের প্রযুক্তি, এমনকি শহরও, এমন হওয়া উচিত যা পুরোনো হলে বায়োস্ফিয়ারেই আবার মিশে যেতে পারে। সেই এক সময় যেমন মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে সেই ভাঁড় মাটিতে ফেললে আবার মাটিতেই মিশে যেত, সেই রকম।

সারোয়ার তুষার : প্ল্যানেটারি এই যুগে মানুষি ক্রিয়াকলাপের ফলে শরণার্থী, ভবঘুরে, যাযাবর, রাষ্ট্রহীন, 'অবৈধ' অভিবাসী মানুষেরা যেমন হালের সাবলটার্ন, একইভাবে না-মানুষ তথা এই গ্রহটাকেও 'সাবলটার্ন' বলতে পারা

যায় কি না? যদি যায়, সে ক্ষেত্রে এই নতুন প্ল্যানেটারি সাবলটার্নের ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি ও ফ্রেমওয়ার্ক কেমন হবে?

দীপেশ চক্রবর্তী : তুমি আমার মনের ভেতরের ছবি ও ভাব, দুটিই ধরতে পেরেছ, তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। গায়ত্রীর কথাটিও ভাবার মতো। শুধু একটি কথা মনে রাখতে হয়। মানুষ এই গ্রহের নানান প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে ঠিকই, সেই হিসেবে মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। কিন্তু ভাবো, প্রাণের আরেকটা মহাবিলুপ্তি ঘটিয়ে মানুষ তার গ্রহীয় ক্ষমতা ও ভূমিকা জাহির করতে পারে, কিন্তু তারিফ করার জন্য, দেখার জন্য থাকবে কে? বাহাদুরি কে দেবে? প্রাণের মহাবিলুপ্তি হলে মানুষ তো আর বাঁচবে না। আর অত যদি না-ও হয়, যদি এমনও হয় যে পৃথিবীর অনেক জায়গা আর মানুষের জন্য বাসযোগ্য রইল না। মানুষে মানুষে জমিজমা নিয়ে আবার হানাহানি শুরু হলো, তাতে মানুষের ক্ষতি বৈ লাভ কী? পাথুরে এই গ্রহটা তো আর লাভ-লোকসানের হিসাবে চলে না। তাই সে সাবলটার্নও ঠিক নয়। আসলে, মানুষের ইতিহাসের ক্যাটাগরি দিয়ে তাকে ধরাই মুশকিল।

সারোয়ার তুষার : ক্লাইমেট চেঞ্জকে সাধারণত পলিসিগত কিংবা বৈজ্ঞানিক সংকট মনে করা হয়; যার সমাধানও পলিসিগত এবং বৈজ্ঞানিক হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। ক্লাইমেট চেঞ্জ বা অতিমারি প্রশ্নে ইতিহাসের হস্তক্ষেপ কেন জরুরি?

দীপেশ চক্রবর্তী : ধরো, এই যে এয়ার, সেই এয়ারের কথা বলছি, বাতাস; যা না থাকলে আমরা বাঁচতাম না। মানে আমাদের বিবর্তনের ভাবনায়, আমাদের বাতাস আছে বলে আমাদের ফুসফুস আছে। সেইভাবে আমরা বিবর্তিত হয়েছি, যে কারণে এই করোনাভাইরাস ফুসফুসটাকে আক্রমণ করে। তো এই বাতাস কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই না করলে থাকে না। অথচ অক্সিজেন সাপ্লাই করলে এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে পুড়ে না যায়, আমরা যেন শ্বাসরুদ্ধ না হয়ে যাই। এই বাতাস কত দিন ধরে আছে এই অবস্থায়? বিজ্ঞানীরা এটাকে পৃথিবীর 'মডার্ন অ্যাটমোস্ফিয়ার' বলেন। পৃথিবীর বয়স তো চার বিলিয়ন বছরের বেশি। বাতাস এই অবস্থায় আছে ৩৭৫ মিলিয়ন বছর ধরে। মানুষের জন্য এই বাতাস তৈরি হয়নি। এ বাতাস তৈরি হয়েছে সব প্রাণীর জন্য। এ বাতাস না হলে আমরা বাঁচতাম না। কিন্তু এ বাতাস তৈরি করে কে? বলেছিলাম যে এই গাছ, সামুদ্রিক ছোট ছোট ফাইটোপ্ল্যাংকটন। সমুদ্রের টেম্পারেচার যদি আমাদের গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, কাল্পনিক একটা সিচুয়েশন বলছি, তাহলে প্ল্যাংকটনগুলো মারা যাবে। প্ল্যাংকটন মারা যাওয়া মানে

অক্সিজেনের একটা সাপ্লাই কমে যাওয়া। আমরাই কমিয়ে দেব, ফলে আমাদেরই সর্বনাশ।

এখন ইতিহাসের ইন্টারভেনশন কেন জরুরি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি খুব সহজ করে বলব যে ইতিহাসের ইন্টারভেনশন হয়তো যে অর্থে পলিসি জরুরি, সে অর্থে জরুরি নয়। কিন্তু ইতিহাসের ইন্টারভেনশনের আগে একটা পারসপেক্টিভ আসে যে আমরা মানুষকে কীভাবে দেখব। আমার নিজের কাজে আমি এই গ্লোব আর প্ল্যানেটের মধ্যে একটা তফাত করেছি। করে, আমি বলছি যে মানুষের নিজেকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। একটা হচ্ছে মনুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ, আরেকটা হচ্ছে না-মানুষকে (non-human) জায়গা দিয়ে। মানুষকে একটু কেন্দ্রচ্যুত করে দেখলে প্ল্যানেটটাকে বোঝা যায়। তার জন্য আমি অ্যাটমোস্ফিয়ারের উদাহরণটা দিলাম; যে অ্যাটমোস্ফিয়ারের ওপর আমরা একেবারে ক্রিটিক্যালি বেঁচে থাকি, কিন্তু সেটা আমাদের খাতিরে তৈরি হয়নি। এই অ্যাটমোস্ফিয়ারটা সব প্রাণীর জন্য। এখন আমি যদি atmospheric Justice-এর কথা ভাবি, তখন আমাকে ভাবতে হবে মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীদের, যাদের অ্যাটমোস্ফিয়ার দরকার, তাদের জাস্টিস কি আসতে পারে? এই যে 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো'। কিন্তু এখানে আমি যে বায়ু বিষায়িত করছি, এর ফলে তো শুধু মানুষ ভুগছে না, অন্য প্রাণীও তো ভুগছে। ফলে তাদের সঙ্গে যদি আমাদের জাস্টিসের প্রশ্নে আসতে হয়, তাহলে তো একটা দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখতে হয়। সেই দৃষ্টিকোণ কিন্তু বিজ্ঞানীকে পড়ে একটা ইতিহাসমনা মানুষই তৈরি করবে। ফলে সেটা ঐতিহাসিকই হতে হবে তা না, বিজ্ঞানীরা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসই লিখছেন। যাঁরা জিওলজি লিখছেন, বায়োলজি লিখছেন, তাঁরা আরেক ধরনের ইতিহাসই লিখছেন। সেই বড় ইতিহাসকে আমাদের ছোট ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তুমি তো আমার *Climate of History in a Planetary Age* বইটা পড়েছ। বইটা কিন্তু এই প্রশ্নেরই আমার মতো করে একটা বিশদ উত্তর।

বিশ্বনেতাদের কথা বলছ। আমার মনে হয় তাঁদের পক্ষে গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদির বাইরে এসে ভাবা সম্ভব নয়। অন্তত এই মুহূর্তে। আমি নানা জায়গায় বলেছি, জলবায়ু সংকট ও বর্তমান অতিমারির সঙ্গে কিন্তু মানুষের রমরমা বৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যার জন্য বিজ্ঞানীরা এই পিরিয়ডটাকে বলেন যে মানুষের ইতিহাসে একটা মহাত্বরণ (great acceleration) ঘটেছে। আমাদের এই 'হোমো স্যাপিয়েন্স' প্রজাতির বয়স যদি তিন লাখ বছর হয়, তাহলে বলা

যায় যে প্রায় এই পুরো সময়টাই মানুষের লেগে গিয়েছিল সংখ্যায় এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটিতে পৌঁছাতে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল দেড় শ কোটির মতো। ২০০০ সালে তা দাঁড়াল ৬০০ কোটিতে, এক শ বছরে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি। এরও বেশির ভাগটাই ১৯৫০-এর পর। ভারতের জনসংখ্যা ১৯৪৭-এর পর চার গুণের বেশি বেড়েছে। শুধু জনসংখ্যা নয়, এই ১০০ বছরে শহুরে মানুষ বাড়ল ১৩ গুণ, যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বাড়ল ৩৫ গুণ, শক্তির ব্যবহার ১২ গুণ, পেট্রলের ব্যবহার ৩০০ গুণ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৩৫০ গুণ, মৎস্যশিকার ৬৫ গুণ, রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন এক হাজার গুণ, আর মোটরগাড়ির সংখ্যা ৭ হাজার ৭৫০ গুণ। মানুষের অর্থনীতির বহর বাড়ল ১৫ গুণ। সেই সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার কমে এবং জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় মানুষের, এমনকি গরিব মানুষেরও আয়ু বাড়ল গড়পড়তা। গত ২০ বছরে এই বৃদ্ধি অব্যাহত। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো প্রজাতি কোনো দিন এত আরামে থাকেনি, এমনকি মানুষও না!

আবার ফ্রিজ, গাড়ি কিনতে পারেন, এমন মানুষের সংখ্যাও যে কীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তা দেখলে আশ্চর্য লাগে। ২০১৭ সালের একটি রিপোর্টে দেখছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পর এই রকম ভোগী মানুষের সংখ্যা ১০০ কোটি হতে সময় লেগেছিল ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। আর সেই সংখ্যা ২০০ কোটিতে পৌঁছাতে লেগেছে মাত্র ২১ বছর (২০০৬), ৩০০ কোটি হতে ৯ বছর (এর বেশির ভাগই চীনে)। এঁরা আরও বলছেন যে চীনের জনসংখ্যা ৪০০ কোটিতে দাঁড়াতে লাগবে ৭ বছর (২০১৭ থেকে), আর হয়তো ৫০০ কোটিতে পৌঁছাবে ৬ বছরে, ২০২৮-২৯ সাল নাগাদ। ২০০০ সালে পৃথিবীতে যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কনজাম্পশনের দিক থেকে, যারা ফ্রিজ কেনে, গাড়ি কেনে—তাদের মধ্যে ৭০ ভাগই ছিল ইউরোপিয়ান-আমেরিকান ইত্যাদি। এখন ইউরোপিয়ান-আমেরিকানরা আছে ৩০ ভাগ। কনজিউমিং ক্লাস মূলত এখন চীনদেশে, ভারতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসে গেছে। ফলে বিশ্বনেতারা খুব শিগগির এই রমরমা ছাড়তে চাইবে বলে মনে হয় না। আসলে মানব-প্রজাতির লাগামছাড়া আত্মকেন্দ্রিকতায় আজ পৃথিবী নামক গ্রহটা বিপন্ন। আমাদের সভ্যতাই জলবায়ু ও অতিমারির সংকট তৈরি করে আমাদের বিপদ ডেকে আনছে। মানে আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি যে আমরা একটা টেকনোলজির ঘোড়ায় চেপেছি। এই টেকনোলজি ছাড়া এত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ফলে আমাদের এখন টেকনোলজিক্যাল গ্যাম্বল করতে করতে

এগোতে হচ্ছে। এটা থেকে মানুষ কী করে বেরোবে, কোথায় অন্যদিকে যাবে, এগুলো আলোচনার প্রশ্ন, তর্কের প্রশ্ন।

তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, মানুষ ঠকে ঠকে ধুঁকে ধুঁকে শিখবে। আমার আশা হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে সবাই যাচ্ছি। বড়লোক দেশগুলোও যাচ্ছে। সংকট বাড়ছে, আমাদের আলোচনা হচ্ছে, মানুষের ডিজঅ্যাগ্রিমেন্ট থাকবে। এ কোনো সহজ রাজপথ নয়, যেখান দিয়ে একটা সমাধানে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু আমার এইখানে আশা হয় যে মানুষ তো শেখে, মানে, যাকে বলে উই আর আ স্পিসিস দ্যাট ক্যান লার্ন। ফলে আমার ধারণা, শিখবে কিন্তু দাম দিয়ে শিখবে। অভিজ্ঞতার দাম দিয়ে শিখবে এবং মানুষকে দুঃখ পেতে হবে। এই যে ঘূর্ণিঝড় আম্পান বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানল, মানুষ কি দুঃখ পায়নি? অস্ট্রেলিয়ায় এতগুলো লোক মারা গেল, এত আগুন হলো, মানুষ কি দুঃখ পায় না? দুঃখ পাবে কিন্তু আমার ধারণা, মানুষের সমাজে ইকোনমি এবং টেকনোলজির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথা বারবার উঠবে। ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের কথা বারবার উঠবে। এখন সেটা অলরেডি উঠতে শুরু করেছে। এই জিনিসগুলো হলেই কিন্তু অনেকখানি এগোবে। আমরা রাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অনেক নিতে পারি, যেমন প্রত্যেক গরিব মানুষের একটা বেসিক ইনকাম থাকতে হবে।

যেমন ধরো আজকে দিল্লিতে কী হয়? দিল্লিতে গরম বাড়ছে, লোকে এয়ারকন্ডিশনার কেনে। সরকার তো এমন বাড়ি সাবসিডাইজ করতে পারে, যাতে এয়ারকন্ডিশনার না কিনতে হয়, বাড়ির ডিজাইন বদলাতে পারে, বাড়ির কোড বদলাতে পারে, অনেক অপশন আছে। কিন্তু হয়তো খোঁজ করলে দেখবে যে এয়ারকন্ডিশনার ম্যানুফ্যাকচারিং লবির হয়তো একটা চাপ আছে যে এয়ারকন্ডিশনারের রমরমা, এখনই অন্য কিছু কোরো না, যাতে এটাই সমাধান হয়। ফলে এর মধ্যে রাজনীতি এসে পড়ে। বৈষম্যের রাজনীতি এসে পড়ে, ধনতন্ত্রের রাজনীতি এসে পড়ে এবং তার ভেতর দিয়েই যেতে হবে। এ ছাড়া তো উপায় নেই। এটাই বলছি যে আমাদের মতপার্থক্যের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু আমার এটাও ধারণা—যত সংকট বাড়ছে, যার জন্য আমরা এত কথা বলছি, তত আবার একটা চাপও হয় একদিকে ঝোঁকার। রাতারাতি বিশ্বনেতাদের সংবিৎ ফিরবে না, কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে তাঁদের নতি স্বীকার করতেই হবে।

সাহিত্য

‘পানিপথ’-এর দুই ঠিকানা, জাতীয় ভাবের দুই কল্পনা

ইমরান কামাল

কোনো দেশে জাতীয় চৈতন্য বাস্তব জমিনে পা রাখার আগে আগুয়ান সমাজ ও সেই সমাজের বিদ্বৎজনের কল্পনায় তা আসে। সেই কল্পনা আকার পেতে থাকে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা মুহূর্তকে কেন্দ্র করে। কল্পনা প্রতীকায়িত হয় এবং ক্রমে তা সামূহিক চৈতন্যের অংশ হয়ে যায়। এমনকি জাতীয় ভাব বাস্তব চেহারা নেওয়ার পরও কিন্তু কল্পনার এই অভিযাত্রা থেমে থাকে না। ইতিহাসে দেখা যায়, জাতীয় ভাব ও কল্পনার নেতৃত্ব থাকে আগুয়ান শ্রেণির হাতে। আর সেই শ্রেণির মধ্যে যে জাতীয় ভাব ও কল্পনা গড়ে ওঠে, তার সংকট ও সম্ভাবনার আয়না হয়ে ওঠে সেই শ্রেণির সাহিত্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* ও কায়কোবাদের *মহাশ্মশান*-এর পর্যালোচনায় ইমরান কামাল ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই ধরনের কল্পনার রূপরেখা দেখতে পেয়েছেন। ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে দুটি সাহিত্যকর্মের তুলনার চমৎকার প্রয়াস ‘“পানিপথ”-এর দুই ঠিকানা, জাতীয় ভাবের দুই কল্পনা’ প্রবন্ধটি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮১৭—১৮৯৪) ও কাজেম আল কোরায়শীর (বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে যিনি কায়কোবাদ নামে সুপরিচিত, ১৮৫৭—১৯৫১) সাহিত্যজগতের মধ্যে তুলনা-বিচার চলে না। একজন ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম যুগের সমাজচিন্তক ও দার্শনিক, অন্যজন উনিশ শতকের শেষ পর্বের সমাদৃত কবি। দুজনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। তারপরও দুই ভুবনের এই দুই বাসিন্দাকে এক শিরোনামে বন্দী করা কেন? কারণ, তাঁরা দেশভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ওপর রচিত দুটি অসামান্য সাহিত্যকর্মের স্রষ্টা। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে উপজীব্য করে ভূদেব রচনা করেন *স্বপ্নলব্ধ*

ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০২ বঙ্গাব্দ, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ)। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কায়কোবাদের হাতে সৃজিত হয় *মহাশ্মশান* (১৯০৪)। দুই গ্রন্থেই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ চিত্রিত হয় ভারতের জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হিসেবে। একই সঙ্গে উভয় রচনার বয়ান ও বর্ণনায় ভারতবর্ষের জাতীয়তার কল্পনা এবং জাতীয় ভাব প্রসঙ্গ হিসেবে জোরালোভাবে উপস্থিত। *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার (ভূদেবের দৃষ্টিতে 'হিন্দু জাতীয়তা') পরাজয় এবং 'স্বাধীন ভারত' নামের স্বপ্নের শেষ সম্ভাবনার মৃত্যু হিসেবে হাজির হয়। *মহাশ্মশান*-এ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের বীরত্বের গৌরবময় কীর্তিগাথা (কায়কোবাদের ভাষ্যে 'জাতীয় গৌরব', ১৯৯৪ : ৩৫১)।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, দুটি রচনাই তাঁদের স্বস্ব সময়খণ্ডের (কোনো ক্ষেত্রে পরের কালেও) বিদ্বৎসমাজে হয় উপেক্ষিত, না হয় তীব্র কটাক্ষের শিকার। ভূদেবের স্বপ্নকল্পনার অখণ্ড ভারত তাঁর সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফিকশনাল ও অলীক রাষ্ট্রকল্পনার বিরাট নির্মিতির নিচে চাপা পড়ে। আর কায়কোবাদের জাতীয় গৌরবের আখ্যান তৎকালীন বাংলার (বিশেষ করে) মুসলমান সমাজে সৃষ্টি করে বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া। এই কাব্যের বিরুদ্ধে আনা হয় 'নীতিহীনতা'র ভীষণ অভিযোগ (১৯৯৪ : ৪৪৬)। তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে একভাবে উপেক্ষিত *মহাশ্মশান* পরবর্তী সময়ে মুনীর চৌধুরীর (*রক্তাক্ত প্রান্তর*, ১৯৬২) হাতে নবজীবন পায় বটে। কিন্তু সাবভার্সনে (sub version) যুদ্ধবিরোধী চেতনা আর সেক্যুলার ভাবের ভিড়ে তার পুরোনো মহিমা ঢাকা পড়ে যায়। সমকালীন উপেক্ষা আর তির্যক আক্রমণের পরও ভূদেবের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* পরবর্তী প্রজন্মের 'ভারত' কল্পনায় এবং উপনিবেশবাদবিরোধী ভাবাদর্শিক শিবিরে চিন্তার রসদ জুগিয়ে গেছে। আবার অন্যদিকে *মহাশ্মশান*-এর তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের চোরাস্রোতের মতো মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী মৃধাদের (*পাতকী পানিপথ*, ১৯৮৪) সাহিত্যিক নির্মিতির মধ্য দিয়ে বলা যায়, বদলে গিয়ে জীবিত থেকেছে।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে উপজীব্য করে এ দুই গ্রন্থনাকে পাশাপাশি রেখে পড়ার উদ্দেশ্য, বাঙালি উচ্চবর্গ ও বাংলার অগ্রণী শ্রেণির সংস্কৃতিতে 'জাতীয় ভাব' ও 'জাতীয় পরিচয়'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অলীক কল্পনার তত্ত্ব-তালাশ এবং জাতীয় ভাব ঘিরে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলায় বেড়ে ওঠা উচ্চবর্গের চিন্তাসংকটের ওপর মোটাদাগের অনুসন্ধান চালানো।

২.

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* সাহিত্যের প্রচলিত ধরনের ছাঁচে ফেলে পাঠ করা মুশকিল। আবার এ লেখায় সাহিত্যকল্পনার এত প্রশ্রয় আছে যে একে সাহিত্য-আঙিনার বাইরে রাখাও কঠিন। অন্যদিকে ইতিহাস হিসেবে এই রচনার এক রকম পাঠ দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আগাগোড়া বয়ানধর্ম ইতিহাসের উল্টোরথে ঘোরে, তাই একে ইতিহাস হিসেবে না পড়ে কল্পিত ইতিহাসরূপে পাঠ করাই শ্রেয় মনে হয়। ভূদেব নিজেও অবশ্য তা-ই চেয়েছেন; অর্থাৎ পাঠক তাঁর এই রচনা একটি অলীক (utopic) কল্পনা হিসেবে পাঠ করুন। এমন এক স্বপ্ন পাঠকের মনে ঈপ্সিত হোক, যা ভবিষ্যতের কোনো এক পর্বে 'পুনরুত্থান'-এর আশা রূপে ভারতবর্ষে (না হলে অন্তত বাংলায়) প্রকট হবে।

১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* রচনার পরিপ্রেক্ষিতের একটি চমৎকার বর্ণনা দেন। সেই ভূমিকায় তিনি বলেন :

> আমার কোন আত্মীয় একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি ঐ পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়া দেখিতেছি। যে দিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, সে বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম। (২০১৪ : স্ব.ভা.ই. গ্রন্থের ভূমিকা)

আত্মীয়রচিত (অথবা অনুবাদিত) ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের অংশটি পড়তে গিয়ে ভূদেবের অসুস্থ হয়ে পড়াটা ঘটনা হিসেবে বেশ চিন্তাজাগানিয়া হলেও পানিপথের ইতিহাস পাঠের সঙ্গে এর সংযোগকে সমাপাতনিক বা আকস্মিক বলে ধরে নেওয়াই ভালো। তবে তার বাইরেও ভূদেব লিখিত গ্রন্থের ভূমিকাতে এই অসুস্থতার আলাদা তাৎপর্য আছে। ভূদেব অসুস্থ বোধ করেছেন, তাই রচনাটি পাঠে নিবৃত্ত হয়েছেন। আর সেই ফাঁকে তাঁর মনে খেলে গেছে এক অদ্ভুত কল্পনা, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে সমাপ্ত হলে কী হতো। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ভূদেব তাঁর বিচিত্র কল্পনায় একই সঙ্গে দুটি জিজ্ঞাসার সূত্র তৈরি করেছেন। প্রথমত, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরিণতি অন্য কী রকম হতে পারত? দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পরিণতি অন্য রকম হলে ভারতবর্ষের হালসুরত কেমন হতো? তাঁর *স্বপ্নলব্ধ* সমগ্র রচনাটিই বলতে গেলে

এই দুই জিজ্ঞাসাকে এক কল্পিত সুতায় বাঁধার নিবিড় চেষ্টা।

ভূদেব তাঁর গ্রন্থের ভূমিকার পরবর্তী অংশে যে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যাবে, এই সৃজনকল্পকে তিনি কিছুটা দৈবগুণে প্রাপ্ত বাণী বলেও মনে করেছেন। যেন কেবল 'আমি' নয়, আরেক 'পশ্চাতের আমি'ও তাঁর লিখনে পাশাপাশি সক্রিয় থেকেছে। যেন স্বপ্নে পাওয়া, কিন্তু স্বপ্নের অনুঘটককে চেনার উপায় নেই, তাই রচয়িতাকে সৃজনকর্মটির নামের সঙ্গে 'স্বপ্নলব্ধ' কথাটা জুড়ে দিতে হয়েছে। তাঁর ভূমিকার শেষাংশে একখণ্ড শাস্ত্রকথা আছে, 'স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে' (স্ব.ভা.ই. গ্রন্থের ভূমিকা)। ভূদেবের কাছে 'স্বপ্ন' নিত্যযাপনের বিমূর্ত চলচ্চিত্র বা আয়নাবাজি নয়। তাঁর জগতে স্বপ্ন এমন সক্রিয় সম্ভাব্যতা, যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

৩.

আত্মীয়রচিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ইতিহাস পড়তে গিয়ে ভূদেব যুদ্ধের যে অন্য রকম পরিণতি কল্পনা করেন, তার রূপ ক্রমে স্বচ্ছ হয় *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এর প্রথম পরিচ্ছেদে। ভূদেবের স্বপ্নকল্পিত বিকল্প 'পানিপথে'র যুদ্ধ সমাপ্ত হয় মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মারাঠা সেনাপতিদের সুচতুর যুদ্ধকৌশলের কাছে পরাস্ত হয় আহমদ শাহ আবদালী দুররানির নেতৃত্বে সংগঠিত মুসলিম বাহিনী। যুদ্ধের অন্তিমলগ্নে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও যুদ্ধরত আহমদ শাহ আবদালীর কাছে মহারাষ্ট্রীয়দের বন্দী কাশীরাজ বিশেষ দূত রূপে আবির্ভূত হন। মহারাষ্ট্রীয়দের বিশেষ দূত কাশীরাজের মুসলিম শিবিরে আগমন যে বার্তা বয়ে আনে তার মূল কথা, 'ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রকৃতির অন্যথাচরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পূর্বের ন্যায় এক্ষণেও সদয় আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ দলবল সহিত নির্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করুন' (২০১৪ : ৩১)। এই বার্তার মূলকথা, 'ক্ষমাশীলতা', যার ওপর 'হিন্দু জাতীয়তা' প্রতিষ্ঠিত। ভূদেবের কল্পনায় ক্ষমা হিন্দু জাতির মৌলিক প্রকৃতি, তাই সুনিশ্চিত বিজয় এবং মুসলিম বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করার সুযোগ থাকার পরও মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষ থেকে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠানো সম্ভব হয়। এভাবে হিন্দু জাতির জাতীয়তা এবং চৈতন্য যে পৃথক ধাতুতে গড়া, তার রূপ ভূদেবের স্বপ্নকল্পনায় শুরু থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে।

এভাবে হিন্দুপ্রকৃতির ক্ষমাশীলতার স্মারক হিসেবে সন্ধিপ্রস্তাব এবং যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তির পর ভূদেব

মনোনিবেশ করেন তাঁর কল্পনায় স্থিত দ্বিতীয় জিজ্ঞাসায়। যেখানে পরবর্তী ৯ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত তাঁর কল্পনাযুদ্ধের পরিণতি অন্য রকম হলে ভারতবর্ষের হালসুরত কেমন হতো, এর জবাব দিয়ে যায়।

ভূদেবকল্পিত ভারতবর্ষের বিকল্প ইতিহাসে অখণ্ড ভারতের সম্রাট হবেন রামচন্দ্র। সপ্তদশ মোগল সম্রাট 'মহামতি শাহ আলম' স্বেচ্ছায় তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেবেন। ভূদেবের রামচন্দ্র কল্পিত চরিত্র। মারাঠা ইতিহাসে দ্বিতীয় শিবাজিপুত্র 'রাম' নামে পরিচিত। এই পরিচয় ভূদেবের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাসের বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু এর বাইরেও ভূদেবের কল্পনায় 'রামচন্দ্র'-এর পৌরাণিক তাৎপর্যও আছে, নামে তার মহিমা বোঝা যায়। ইতিহাসের রাম আর মিথের রামচন্দ্র একাকার হয়ে যে চরিত্রটি দাঁড়ায়, তাকে অগ্রে রেখে অখণ্ড ভারতের সংবিধানের কল্পনা করেন ভূদেব। সেই সংবিধান সভা বসে মোগল দিল্লির প্রখ্যাত জুমা মসজিদে। সেই সভার সভাসদদের কথোপকথনে 'রাম' নামের আরেক রূপ প্রস্ফুটিত হয়, 'যে রাম সেই রহীম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়' (২০১৪ : ৩৭)। এই নাম ভূদেব বলিয়েছেন অভিবেশন সভায় উপস্থিত এক ব্রাহ্মণের কণ্ঠে এক মুসলমানের উদ্দেশে। এমন কথা শুনে সেই শ্রোতা মুসলমানই-বা নীরব থাকবেন কেন। কণ্ঠে আরও একপ্রস্থ মধু মাখিয়ে তিনি উত্তর দিচ্ছেন, 'ঠাকুর যথার্থ কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভূতি মাত্র, মানুষভেদে যেমন আচরণভেদ, পরিচ্ছদভেদ, ভাষাভেদ তেমনি উপাসনার প্রণালিভেদও ভেদ হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরাইয়া দেখিতেছেন। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নীচে লহু লাল বই কাহারো কাল, কাহারো জরদ নহে' (২০১৪ : ৩৭)। এ থেকে বোঝা যায়, ভূদেবের স্বপ্নলব্ধ অলীক রামরাজত্বের হিন্দু-মুসলমান ভারতের মসনদে রামচন্দ্রের অধিষ্ঠানকে কেমন সম্প্রীতির সঙ্গে বিবেচনা করে থাকবে। ভূদেবের রচনায় এই সম্প্রীতির অন্য গুরুত্বও আছে। স্বপ্নলব্ধ কল্পনার বয়ানে ভূদেব ভারতের যে সংবিধান ও রাষ্ট্রপরিকল্পনা হাজির করবেন, এমন চমৎকার সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট থাকলে তা পাঠকের কাছে অধিক নির্ভরযোগ্যও হবে। এই প্রেক্ষাপটে কল্পনার বিকাশে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রফলকে সংবিধান রচিত হতে থাকে। ভূদেবের কল্পিত ইতিহাসের সেই সংবিধানে অখণ্ড ভারতের যে রাজনৈতিক প্রকৃতি দাঁড় করানো হয়, তার প্রথম মর্মকথা, অখণ্ড ভারত হবে রাজতন্ত্র। দ্বিতীয় মর্মকথা, সমাজ (হিন্দুসমাজ) এবং গ্রাম (হিন্দুসমাজের প্রাণকেন্দ্র রূপে) হবে ভারতের

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণ। তৃতীয় মর্মকথা, ভারত-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো 'ভগবান'-এর বিরাট মূর্তির মতো চার ভাগে বিন্যস্ত হবে। যার নিম্নভাগে থাকবে কৃষিজীবী, শিল্প-ব্যবসায়ী (ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অর্থে) ও শ্রমিক প্রজারা। অর্থ-প্রতিপত্তিসম্পন্ন বেনিয়া সম্প্রদায় হবে এর মধ্যভাগ। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র হবে এর দুই বাহু। আর পণ্ডিতমণ্ডলী হবে এর মস্তিষ্ক। এই মিলিয়ে ভারতের যে বিরাট রাজনৈতিক শরীরটি দাঁড়াবে, ব্যবস্থাপক সভা হবে তার মুখ। 'আত্মশুদ্ধি', 'নিষ্কাম ব্রত', 'পরার্থ' আর 'সহনশীলতা' হবে ভারতীয়ের জাতীয় ভাব ও ভাবপ্রসূত চৈতন্যের চার স্তম্ভ। ভূদেবের দৃষ্টিতে এই চার স্তম্ভ হিন্দু জাতীয় প্রকৃতির গুণ। ফলে এটা স্পষ্ট যে ভূদেব দেখাতে চাইছেন, হিন্দু জাতীয়তাই অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাব। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা দাঁড়ায়, অপরাপর ধর্ম-সমাজের মধ্যে কেনো অখণ্ড ভারতের জাতীয় ভাব গড়ে উঠবে না? এই জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে হিন্দু জাতীয়তা প্রসঙ্গে ভূদেবের ভাবনা অনুসরণ এবং সেই ভাবনায় তাঁর দৃঢ় অবস্থানের উদ্দেশ্যের দিকে নজর দিলে। প্রথমত, ভূদেব মনে করেন, 'ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান।'

ভূদেবের কথা ঘুরিয়ে বললে দাঁড়াচ্ছে, অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়-সমাজ, যারা দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করছে, তারাও ভারতমাতার পর নয়। কিন্তু যেহেতু হিন্দুসমাজ এই মাতৃকার আপন সন্তান, ফলে জাতীয় ভাব নির্মাণের দায়িত্ব ও অধিকার তার ওপরই বর্তায়। দ্বিতীয়ত, ভূদেব মনে করেন, হিন্দুত্বের সঙ্গে অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্পষ্ট ভাব ও দর্শনগত দূরত্ব আছে। এই দূরত্বের মানসচিত্র পাওয়া যায় তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থে :

১. প্রাক্তন, পুরুষকার ও পরকাল—এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল ও অনাসক্তচিত্ত।
২. ওইরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দ্রব্যগুণবাদতৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্যশালী ও সাধনশীল।
৩. ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খ্রিষ্টধর্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল ও ভোগসুখলিপ্সু।
৪. ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সাম্যধর্মী। (২০১০ : ১৫১)

ভূদেবের দৃষ্টিতে এই সব ধর্মের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্মই 'একাত্মবাদী';

অর্থাৎ তার 'আত্মপর' নেই (২০১০ : ১৬৯)। ফলে বহু জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারত ভাব ও বস্তুগত দিক থেকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে চায়, তবে হিন্দুত্ব ছাড়া তার অন্যথা হওয়ার সুযোগ নেই; অর্থাৎ যেহেতু অন্য ধর্ম-সম্প্রদায় (বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম) একাত্মবাদ ও পরার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং যেহেতু হিন্দুধর্ম একাত্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার 'আত্মপর' নেই (এই বিচারের সঙ্গে সংযুক্তি রূপে এ-ও বলে রাখা যেতে পারে যে হিন্দুধর্মে শয়তান বা absolute evil-এর উপস্থিতি নেই), সেহেতু হিন্দুসমাজের সঙ্গেই অপরের মিলন সম্ভব বলে ভূদেব মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে একাত্মবাদ ও মিলন সম্ভাব্যতা জাতীয় ভাব নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রত্যয়। হিন্দুধর্মে এই প্রত্যয় 'সাদৃশ্যে'র ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ভূদেবের দৃষ্টিতে সাদৃশ্যের উপলব্ধি দুই ধরনের, 'উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধমুখেও হয়' (২০১০ : ১৩১)। এই সাদৃশ্য ধারণাটিকে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে সুদীপ্ত কবিরাজ দেখান :

> According to Indian logic, similarity is a term with a dual meaning. It can mean that objects A and B are directly similar, placed in a relation of identity or indiscernible resemblance. But even if A and B are not directly similar, they may exhibit a negative similarity. B may not be identical to A, but its difference from A may be negligible compared to its differences with C, D, E, etc. (2010 : 259)

অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তিবিদ্যায় সাদৃশ্য যেমন 'তুমি' 'আমার' মতো, এভাবে নির্ণয় করা যায়। তেমনি আবার 'তুমি' 'আমার' মতো না হলেও 'তার' চেয়ে 'তোমার' সঙ্গে 'আমার' মিল বেশি অথবা 'তার' চেয়ে 'তুমি' 'আমার' কাছের, এভাবেও নির্ণয় করা যায়। ফলে সাদৃশ্য এমন ধারণা, যার সাহায্যে 'হ্যাঁ' বা 'বিধি' এবং 'না' বা 'নিধি' দুই পথেই মিলন সম্ভব। আর এই সাদৃশ্যের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে হিন্দুধর্মে অপরত্ব বলে কিছু থাকে না।

এই ধারণা থেকেই ভূদেবের জাতীয়ভাবে মুসলমান এবং অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের যে সুনির্দিষ্ট স্থান থাকবে, তার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ভূদেবের অখণ্ড স্বাধীন জাতীয় ভাব নির্মাণের জন্য এত উদ্যোগের প্রয়োজন বোধ হচ্ছে কেন? কারণ নিহিত আছে তাঁর উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিকের সংস্কৃতিবিরোধী প্রবল অবস্থানে। উনিশ শতকের সমাজচিন্তকদের মধ্যে ভূদেবই প্রথম স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ উপনিবেশের ছায়ায় সংগঠিত ভারত একপ্রকার অখণ্ড রূপ পেয়েছে বটে, কিন্তু অনবরত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুকৃতিজাত হীনতা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির

ভ্রান্তবিলাস তার জাতীয় চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলছে। স্বাধীন জাতীয় ভাব ছাড়া এই দশা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও জিজ্ঞাসা থাকে, ঔপনিবেশিক ভাবের বিপরীতে ভূদেবের জাতীয় ভাবকেন্দ্রিক স্বপ্নকল্পনায় 'সাম্রাজ্য'-এর প্রয়োজন পড়ল কেন। অন্যভাবে বললে, তাঁর বিকল্প তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত রামরাজত্বকে কেন সাম্রাজ্যই হতে হবে? ভূদেব কিন্তু শুধু সাম্রাজ্যের কল্পনাতেও থেমে থাকেননি। তিনি তাঁর স্বপ্নলব্ধ ভারতকে রীতিমতো সমুদ্রবাণিজ্য ও সমরসজ্জায় সজ্জিত একটি মহাশক্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং এই কল্পনার কারণকে নির্দিষ্ট করেছেন যুগধর্মে (২০১৪ : ৪৪-৫০)। ফলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর স্বপ্নকল্পনার 'হতে পারত'র মধ্যে এক 'হয়ে আছে' বিদ্যমান। অনুমিত হয়, তাঁর কল্পনায় এই 'হয়ে আছে'র আবির্ভাব ঘটেছে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার সূত্রেই। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা দাঁড়ায়, ভূদেবের স্বকীয়তার অলীক কল্পনার সঙ্গে পরকীয় বাস্তবতার মিলনের মধ্য দিয়ে সৃজিত এই যে খোয়াব, তা কি স্রেফ কল্পনার খাতিরে কল্পনা? এক 'হতে পারত'র সঙ্গে এক 'হয়ে আছে'র যুগলবন্দীতে কী 'হতে পারে' নামের এক সম্ভাব্যতাও উঁকি দিয়ে যায় না? *স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস* নামে ভূদেব যে স্বপ্ন হাজির করেন, তা আর যা-ই হোক, অতীতমুখী নয়। প্রফেটিক ও ভিশনারি উপাদান তাতে এত প্রবল মাত্রায় আছে যে তাকে ভারতবর্ষের কল্পিত সম্ভাব্য ভবিষ্যতের 'আশা'রূপে দেখলেও বাড়িয়ে দেখা হয় না।

৪.

কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্যের গ্রন্থরূপে আবির্ভাবের সময়টা বেশ চিত্তাকর্ষক। বঙ্গভঙ্গের এক বছর আছে, তখন এই কাব্য প্রকাশ পেয়েছিল। সেকালে বাংলার রাজনৈতিক আবহ কেমন ছিল, তা বোধ করি সহজে অনুমেয়। সেকালে এই কাব্য যে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, তার কথা নিবন্ধের শুরুতেই উল্লিখিত আছে। বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজে এই কাব্যের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বেশি। সে সময় এই কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ফজলর রহমান খাঁ, সৈয়দ এমদাদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীরা। আবার এই কাব্যের প্রশংসা করে দীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন। এর মধ্যে *মহাশ্মশান* প্রসঙ্গে সেকালের বাঙালি মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো বোঝা যায় মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'মহাশ্মশান কাব্য' নামে রচিত প্রবন্ধের শেষাংশের বর্ণনায় :

> ...কতিপয় দোষ এবং কাব্যগত আরও কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও *মহাশ্মশান* যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠতম এবং ভাষাজননীর অন্যতম সুন্দর অলংকার তৎসম্বন্ধে আশা করি কোনরূপ মতদ্বৈধ হইবে না। বাঙ্গালী মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা এমন সুন্দর কাব্যের সমাদর করিতে পারিতেছেন না। (১৯৯৪ : ৪১৫)

মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে মুসলিম সমাজে এই কাব্য যতটা আদর পাওয়ার কথা, ততটা পায়নি। বিশেষ করে মুসলিম নারী চরিত্র নির্মাণে কায়কোবাদ যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, বাঙালি মুসলিম সমাজ তাকে যথেষ্ট রুচিশীল সৃজন বলে মনে করেনি। এর বাইরেও *মহাশ্মশান*-এর একটি বিশেষ তাৎপর্যের কথা মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের বক্তব্যে স্পষ্ট। শামসুদ্দীন এই কাব্যকে জাতীয় সাহিত্য বলে অভিহিত করেন। কারণ, এই কাব্যের প্রেক্ষাপট, বিষয় ও ব্যাপ্তি। কায়কোবাদও যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতীয় ঘটনা হিসেবে মনে করেছেন, তা গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রেই উল্লেখ আছে (১৯৯৪ : ৩৫১)। কবির দৃষ্টিতে কাব্যটিতে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ ঘিরে জাতীয় ভাবের আধার খোঁজার চেষ্টা আছে। সেই আধারের সন্ধান যে কায়কোবাদ *মহাশ্মশান*জুড়ে করে গেছেন, তার উদাহরণ কাব্যের বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। কায়কোবাদ বোধ করেন, তাঁর কাব্য এবং কাব্যের বিষয় 'জাতীয় গৌরবের মহাশ্মশান' (১৯৯৪ : ৩৫১) এবং সেই গৌরবের সঙ্গে জুড়ে দেন 'আমাদের' শব্দটি। এই 'আমাদের' বলতে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই বোঝাতে চান। *মহাশ্মশান*-এ তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

মহাশ্মশান-এ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে উপজীব্য করে জাতীয়তার বোধ বিরাজমান থাকে ঘটনার সমাবেশে, চরিত্রদের দৈনন্দিন বীরত্ব, প্রেম, প্রতারণা, বিরহ, হিংসা, আক্রোশ, লিপ্সা, খেউর, কামনা, নৈতিকতা, ধর্মবোধ, ছোট ছোট বিজয়ের উল্লাস এবং ছোট ছোট পরাজয়ের গ্লানির মতো মানবিক প্রকাশ, অনুভব ও অনুভূতির মধ্যে। ভূদেবের মতো কায়কোবাদ বিকল্প ইতিহাসের বৈপ্লবিক কল্পনা করেননি। *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এর মতো জাতীয়ভাবের বিপুল প্রজ্ঞাদীপ্ত দার্শনিক অভিজ্ঞান *মহাশ্মশান*-এ নেই। কথাটি ঘুরিয়ে বললে, এই কাব্যে আছে দার্শনিক অভিজ্ঞানের প্রতিস্থাপনা রূপে মানবিক অনুভব। তিন খণ্ডে রচিত এই বিশাল আখ্যানের প্রথম খণ্ড পরিক্রমণিত হয় জোহরা বেগম-ইব্রাহিম কার্দি এবং হিরণবালা-আতা খাঁ প্রণয়-সম্বন্ধের নানান ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে। একদিকে প্রেম, ব্যক্তি-সম্পর্ক; অন্যদিকে ধর্ম, সম্প্রদায় ও কর্মনীতি

তাদের জীবন দ্বিখণ্ডিত করে রাখে একাধারে মানবিক ও সত্তার সংকট রূপে বিরাজমান থেকে। ফলে দেখা যায়, আখ্যানে প্রধান প্রধান চরিত্রের মনে একাধারে সামষ্টিক পরাজয়ের ভীতি এবং প্রিয়জনকে হারানোর আশঙ্কা দুই-ই সমানভাবে সক্রিয়। বলাবাহুল্য, অস্তিত্বের এই প্রবল টানাপোড়েনের মৌলিক কারণ 'পানিপথের তৃতীয় সমর'। কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে সেই সমর এক প্রকাণ্ড সংঘটন রূপে আবির্ভূত হয়, যা শেষ হয় মুসলিম শিবিরের বিজয় ও মারাঠা শিবিরের বিনাশের মধ্য দিয়ে। আখ্যানের শেষ ভাগে বিজয়ী ও বিজিত—উভয় পক্ষের মানসে বেদনার গাঢ় অনুভূতিই স্থায়ী দাগ হয়ে থেকে যায়। দেখা যায়, চরিত্রের প্রত্যেকেই মহাযুদ্ধের ভেতর চলমান নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধে পরাজিত। কেউ নিহত, কেউ পরাভূত। সমগ্র রণক্ষেত্রে যেন একই সুর গুঞ্জরিত, 'যে রত্ন হারায়ে গেনু এ জন্মের মত/ পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে!/ আর না পাইব তাহা; যুদ্ধে জয়ী হনু/ তাহাতে কী লাভ মোর? ভিখারীর মত/ ভগ্ন প্রাণ নিয়ে আমি চলিনু স্বদেশে!/ সব শূন্য মোর কাছে শূন্য মোর হৃদি,/ শূন্য গৃহ, শূন্য মোর রাজ-সিংহাসন!/ এ শূন্য কি দিয়া আমি করিব পূরণ?' (১৯৯৪ : ৩১৩)। মহাভারতের 'স্ত্রী পর্ব'-এর মতো মহাবিজয়ের উল্লাস নয়, *মহাশ্মশান*ও সৌন্দর্য ছড়ায় অসংখ্য ছোট ছোট হারিয়ে ফেলার বেদনা, মানুষের নিজের কাছে নিজের পরাজয়ের শোকগাথায়। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সব চরিত্রের মধ্যে এমন মানবিক অনুভূতিগুলোর সমান্তরাল উপস্থিতি কাব্যটিকে জাতীয় চরিত্র দেয়। এই চরিত্র থেকে উত্থিত ভাব ভারতবর্ষের দুই প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুভবের অলীক সাম্যাবস্থা তৈরি করে বটে, কিন্তু তা বাস্তবিক রাজনৈতিক মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয় না। কায়কোবাদের তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের জাতীয় বয়ান তাই ইতিহাসের প্রচলিত পথে অগ্রসর হতে হতে হিন্দু-মুসলমান দুই বীর জাতির হয়ে এই গৌরবেই আশ্রয় খুঁজে ফেরে। এক যুদ্ধের আখ্যান-কল্পনায় একাকার না হয়ে তারা রাজনৈতিকভাবে দুই শিবিরেই বিভক্ত থেকে যায়। এই আখ্যান কোনো রাজনৈতিক মোহনায় মেলে না। অমীমাংসা তার মীমাংসা হয়ে থেকে যায়। আর এই কাব্যকল্পনার ফাঁক গলে এমন অশনিসংকেতও কবির শিহরণের কারণ হয় যে মারাঠাদের কবল থেকে ভারতের মুসলমানদের রক্ষায় কাবুলের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী যদি এগিয়ে না আসতেন এবং মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে ইতিহাসের পাতা ও ভারতের মানচিত্র অন্য বর্ণে রঞ্জিত হতো (১৯৯৪ : ৩৫৯-৩৬০)। *মহাশ্মশান*-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কায়কোবাদ আরও বলেন :

> যদিও এই পানিপথের মহাযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরই জয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফল ভোগ করিবার শক্তি তখন তাঁহাদের আদৌ ছিল না। কারণ এই মহাযুদ্ধে উভয় শক্তিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।...যুদ্ধ জয়ের কিছুকাল পরেই মহাবীর আহম্মদ সাহ্ আব্দালী নিজ দেশে চলিয়া যান, ঠিক সেই সময় সেই সঙ্কটময় দুর্দিনে ভারতীয় মুসলমানদের সৌভাগ্যবশতই ইংরেজগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই মহাযুদ্ধই তাহাদের সেই ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।...ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরের অপার করুণা বলিয়াই ভারতে ইংরেজগণের আগমন হইয়াছিল। নচেৎ আহম্মদ সাহ্ আব্দালী চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় কোনও না কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে আবার সেই মুসলমান নর-নারীর প্রাণের পবিত্র শোণিতে রক্ত-প্রবাহিনী বহিয়া ভারতীয় মুসলমানদিগকে গিরি গুহায় ও বনেজঙ্গলে আশ্রয় লইতে হইত। তাই বলিতেছি, ভারতে ইংরেজগণের আগমনে ও তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি পত্তনে মুসলমানদের উপকার বই অপকার হয় নাই। (১৯৯৪ : ৩৬০)

ফলে দেখা যাচ্ছে, ভূদেব সৃজিত ভারতের স্বপ্নলব্ধ বিকল্প ইতিহাস কায়কোবাদের কল্পনাতীত। তাঁর দৃষ্টিতে আহমেদ শাহ আবদালীর ভারতে আগমন, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্রিটিশদের হাতে না গেলে বা এর অন্যথা হলে ভারতীয় মুসলমানের আত্মবিনাশ ও বিলয় ছাড়া অন্য কোনো পরিণতির কথা তিনি ভাবতেই পারেননি। কবিচৈতন্যের এই অভাব একদিকে যেমন ঔপনিবেশিকদের উপস্থিতির নৈতিক বৈধতার ক্ষেত্র তৈরি করে, আবার অন্যদিকে ভূদেবের অখণ্ড স্বপ্নিল ভারতের ভাবকল্পের বিপরীতে এক বিরাট 'নাহং' হয়ে দাঁড়ায়। সাতচল্লিশ পেরিয়ে উপমহাদেশের ওপর দিয়ে এখনো যে ভাব আর পরিচয়-সংকটের লু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, তার একপ্রকার আদিরূপ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে ঘিরে ভূদেব আর কায়কোবাদের ভাবকল্পের বৈপরীত্যের মধ্যেই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

৫.

কোনো দেশে জাতীয় চৈতন্য বাস্তব জমিনে পা রাখার আগে জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের অগ্রবর্তী সমাজ ও সমাজের বিদ্বৎজনের কল্পনায় আসে। সেই কল্পনা আকার পেতে থাকে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা মুহূর্তকে কেন্দ্র করে। কল্পনা প্রতীকায়িত হয় এবং ক্রমে সামূহিক চৈতন্যের অংশ হয়ে যায়। এমনকি জাতীয় ভাব বাস্তব চেহারা নেওয়ার পরও কিন্তু কল্পনার এই অভিযাত্রা থেমে থাকে না (২০১৯ : ১২৭)। ইতিহাসে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, জাতীয় ভাব

ও কল্পনার নেতৃত্ব থাকে অগ্রবর্তী শ্রেণির হাতে। আর সেই শ্রেণির মধ্যে যে জাতীয় ভাব ও কল্পনা গড়ে ওঠে, তার সংকট ও সম্ভাবনার আয়না হয়ে ওঠে সেই শ্রেণির সাহিত্য (২০১৯ : ১২৯)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* ও কায়কোবাদের *মহাশ্মশান*-এর মধ্য দিয়ে এ কথা আরও স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হয়। এটা দেখা যায় যে একই ঘটনায় একজন যেখানে পরাজয়ের গ্লানি বোধ করেন, অন্যজন সেখানে জাতীয় গৌরব খুঁজতে প্রবৃত্ত হন। একই ইতিহাসের বিকল্প কল্পনা একজনের কাছে 'আশা'রূপে হাজির হলে অন্যজনের কাছে তা হাজির থাকে 'অকল্পনীয় আতঙ্ক'রূপে। আবার দুজনের দুই ভাব অনুভবে ঔপনিবেশিকতা হাজির থাকে বিচিত্ররূপে। ভূদেবের কল্পনায় রামসাম্রাজ্যের কাঠামো তৈরি হয় ঔপনিবেশিক যুগধর্মের তরিকায়। কায়কোবাদের মানসপটে ভারতে ঔপনিবেশিকের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানের পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়। আর এসবের মধ্য দিয়ে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত বাংলার দুটি অসামান্য রচনা, সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল শ্রেণির অভিন্ন জাতীয় ভাব নির্মাণে ব্যর্থতার সাক্ষ্যও বহন করে চলে।

● **ইমরান কামাল** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

তথ্যসূত্র

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, 'মহাশ্মশান কাব্য', *কায়কোবাদ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, *কায়কোবাদ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, গায়ত্রী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ২০১৪, চর্যাপদ, কলকাতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, প্রবন্ধসমগ্র, মনস্বিতা সান্যাল ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২০১০, চর্যাপদ, কলকাতা।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, '*মহাশ্মশান* সম্বন্ধে দুই একটি কথা', *কায়কোবাদ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', *রচনাসংগ্রহ* ১, ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Sudipta Kaviraj, 'The Reversal of Orientalism : Bhudev Mukhopadhyay and the Project of Indigenist Social Theory', *The Imaginary Institution of India : Politics and Ideas*, 2010, Columbia University Press, New York.

বই আলোচনা

কয়েক দশকে ‘গ্রামবাংলা’র পরিবর্তনের আদল ও ধারা

দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

গ্রামবাংলার রূপান্তর : সমাজ, অর্থনীতি এবং গণ-আন্দোলন—স্বপন আদনান,
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (২০২২), ঢাকা। মোট পৃষ্ঠা ১৬০।

গ্রাম কী, বাংলা কী ও কোথায়? আর গ্রামবাংলা বলতেই-বা কী বোঝায়? এসবের সঙ্গে পরিবর্তনও সামাজিক বিজ্ঞানের এক বহুল প্রচলিত প্রত্যয়। এর নানান ধরন আছে: পতন, বৃত্তাকার পরিবর্তন ও প্রগতি। আবার বিবর্তন, রূপান্তর ও প্রগতির আদলেও একে ব্যাখ্যা করা হয়। সামাজিক রূপান্তর বলতে গভীর, টেকসই ও বহুমাত্রিক কাঠামোগত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। সাধারণত রূপান্তর কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিসরে সংঘটিত হয়, তবে সামাজিক রূপান্তর সামগ্রিকভাবেও হতে পারে। স্বপন আদনান মুখবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক দশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই বিশাল ক্যানভাসের কয়েকটি খণ্ডচিত্র এই বইয়ে; অর্থাৎ প্রবন্ধ সংকলনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এর মানে দাঁড়ায়, সমাজ, অর্থনীতি ও গণ-আন্দোলনের পরিসরে লেখক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং দাবি করেছেন, গ্রামবাংলায় এসব পরিসরে নির্দিষ্ট রূপান্তর ঘটেছে।

বইটি পড়লে কী জানতে পারবেন?

রণজিত গুহ ও অ্যান্টনি লো নামের দুজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা লেখকের গ্রামবাংলাবিষয়ক আগ্রহের সূত্রবিন্দু। ইংল্যান্ডের গ্রন্থাগারে ছাপার অক্ষর থেকে গ্রামবাংলাকে বুঝতে শুরু করে, গ্রামবাংলার নানান বিষয় নিয়ে লেখকের প্রায়

পাঁচ দশকের মাঠে (সামাজিক বিজ্ঞানে গ্রাম গবেষণায় মাঠের মানে সরাসরি গ্রামে যাওয়া) নিয়মিত কাজ করার অভিজ্ঞতা এই বই রচনায় ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় থেকে গ্রাম গবেষণার সেই আগ্রহ আর কখনো কমেনি। বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকে যে গুটিকয় গবেষক ধারাবাহিকভাবে গ্রাম গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, স্বপন আদনান সেসব বিরল লোকেরই একজন।

বিষয় পরিচিতিতে লেখক জানাচ্ছেন, এই প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু গ্রামাঞ্চলের গঠন, পরিবর্তন ও রূপান্তর। একাডেমিক পরিভাষায় 'রুরাল ট্রান্সফর্মেশন' বলা হয়, নির্দিষ্ট সূত্রভিত্তিক খণ্ডচিত্র বয়ানের মাধ্যমে তার স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইয়ে। এই পরিবর্তন বোঝাতে কৃষিকাঠামো, গ্রামীণ সামাজিক সংগঠন, ক্ষমতা সম্পর্ক, দুর্নীতির সংস্কৃতি, পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি, পুনর্বণ্টনধর্মী ভূমি সংস্কারের সীমাবদ্ধতা, ভূমিগ্রাসের কলাকৌশল, নোয়াখালীর চরে গরিব নদীশিকস্তি প্রান্তিক কৃষকের ভূমির অধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জমি হারানোর বৃত্তান্তসহ বিল ডাকাতিয়ায় উন্নয়ন উপদ্রুত জলাবদ্ধতার বিপরীতে প্রান্তিক কৃষকের প্রতিরোধপর্ব ঘিরে সূত্রভিত্তিক (থিমেটিক) আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।

কীভাবে ও কেন

বইয়ের নামে উল্লিখিত গ্রামবাংলার সামাজিক রূপান্তরকে দেখানোর জন্য লেখক কয়েকটি পরিসর বেছে নিয়েছেন। আবার সেই পরিসরের সামগ্রিক ও প্রতিনিধিত্বকারী চিত্র হাজির করেছেন, এমন দাবিও তিনি করেননি। বরং কেস স্টাডি আকারে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের প্রবণতাগুলো হাজির করতে চেয়েছেন। লেখক একই গ্রামে একের অধিকবার গবেষণা করেছেন, যাকে লঙ্গিচুডিনাল স্টাডি বলে। কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিসরে পরিবর্তন দেখাতে হলে এ ধরনের গবেষণা নকশা অনুসরণ করাই দস্তুর। তবে গবেষণা প্রবন্ধে বহুল প্রচলিত সংখ্যাতাত্ত্বিক বা পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্তের দেখা নেই এসব আলোচনায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত সাত দশকে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের অতীতের রচিত প্রবন্ধগুলোর সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো, যা রেফারেন্স আকারে এসেছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও অভিজ্ঞতাও উল্লেখ করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের গবেষণারীতি অনুসরণ করে লেখক ব্যক্তি ও স্থানের নাম পাল্টে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু অতিসংবেদী হওয়ায় তথ্যের উৎস প্রকাশে অত্যধিক

সতর্কতাও লক্ষণীয়। ১৯৪০-এর দশকে রামকৃষ্ণ মুখার্জির পথিকৃৎ গবেষণা *সিক্স ভিলেজেস অব বেঙ্গল*কে মানদণ্ড ধরে নিয়ে লেখক তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালের পরিবর্তনের মাত্রা ও প্রবণতাকে মূল্যায়ন করেছেন (পৃ. ১৫)। যদিও এরও বেশ আগে রমেশচন্দ্র দত্ত ও আজিজুল হক কৃষক ও কৃষি বিষয়ে জরুরি বই লিখেছেন। সে অর্থে, রামকৃষ্ণ মুখার্জির বইটি পড়া থাকলে এ সময়ের পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে পাঠকের নিজের ও লেখকের আলোচনার মিল-অমিল পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

প্রতি অধ্যায়ের উপপাদ্য

ছয় পৃষ্ঠার মুখবন্ধ বাদ দিলে এ বইয়ের অধ্যায়ের সংখ্যা ছয়টি, যার প্রথমটি বিষয় পরিচিতি। দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম 'গ্রামবাংলার রূপান্তর : অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা'। যেকোনো পরিবর্তন দৃশ্যমান করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে ভিন্ন আরেকটি সময়ের অবস্থার তুলনা করতে হয়। লেখক পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দেশভাগের ১৯৪০-এর দশকের সঙ্গে পরবর্তী দশকগুলোর যথাসম্ভব কালক্রমিক তুলনা টেনেছেন। দেশভাগের ফলে ব্যাপক অভিবাসন ও ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদারি প্রথার পোশাকি বিলোপ বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৯৬০-৭০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের হাওয়ায় উচ্চফলনশীল বীজ, যন্ত্রপাতি, অজৈব সার ও বালাইনাশক কৃষি উৎপাদনের শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধি ঘটায়। মার্ক্সীয় উৎপাদনপ্রণালির ধারণায় বিদ্যমান থাকা উৎপাদনকৌশলে পরিবর্তন আসায় উৎপাদন সম্পর্কে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের কৃপায় (পরামর্শ অর্থে ব্যবহৃত) বাংলার কৃষি উৎপাদনের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র পুনঃস্থাপিত হয়। এতে ম্যাক্স ওয়েবারিয়ান কর্তৃত্বের মডেলে সামান্য আঁচড় লাগে। সাম্প্রদায়িকতার পরিসর ধর্মকে অতিক্রম করে রাজনীতি, ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির জমিনকেও আক্রান্ত করতে সক্ষম হয়। গ্রামবাংলায় আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ও সামাজিক সংঘাত বেড়ে যায়। শিক্ষা ও কর্মজগতে অভিগম্যতা 'মহল' থেকে গ্রামের নারীদের বের করে আনে। সনাতনী যৌথ পরিবার ভেঙে নারীপ্রধান খানা ও একক পরিবার তৈরি হতে থাকলে মূল্যবোধের যন্ত্রণায় কাতর সমাজবিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত বোধ করতে থাকেন। রাস্তাঘাট বা যোগাযোগব্যবস্থা সংহত রূপ নিতে থাকলে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক বেয়ে নগরসংস্কৃতি গ্রামবাংলায় অবলীলায় যাতায়াত শুরু করে। গ্রামবাংলায় নগরসংস্কৃতির আসর

প্রত্যক্ষ করে সাংস্কৃতিক সংরক্ষণবাদীরা 'গ্রাম গেল, গ্রাম গেল' রব তুলে বিলাপ শুরু করেন। গ্রামবাংলার তরুণ-তরুণীরাও শহুরে নাগরিকদের মতো 'আমার জীবনের লক্ষ্য' শিরোনামের রচনা অনুকরণের সুবিধা ভোগ শুরু করেন। গ্রামীণ জীবনে, জীবিকা ভাবনায়, রুচিতে, স্টাইলে বদলে যাওয়ার সুর ভেসে আসে। তা আসলে কতটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের চিরচেনা গ্রামবাংলাকে—এসব বিষয় নিয়েই দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'দুর্নীতির সংস্কৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি'। এ অধ্যায়ে দুর্নীতির দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিদ্যমান আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্কের সাধারণ সূত্র হাজির করা হয়েছে। সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের পাশাপাশি 'পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি'র পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি সর্বব্যাপী প্রসার লাভ করে এবং চলমান থাকার সব যোগ্যতা অর্জন করে। ক্ষমতাকাঠামোর গভীর কৃপালাভ ছাড়া দুর্নীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। দুর্নীতি স্থানীয় পরিসরে সংঘটিত হলেও এর পেছনে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতারাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা কী, তা নিয়েও লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। এই অধ্যায়ের আরও মোক্ষম প্রশ্ন, দুর্নীতি পুঁজিবাদী রূপান্তরের সহায়ক শক্তি কি না। এর সঙ্গে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের সম্পর্ক আঁচ করতে পারা যাবে অধ্যায়টি থেকে।

লেখক চতুর্থ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, 'বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি'। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিগ্রাস নিয়ে বিদ্যায়তনিক গবেষণা ও আলোচনা দুই-ই কম। ভূমিগ্রাস কী, কত প্রকার, কারা ভূমিগ্রাস করে, কী প্রক্রিয়ায় ভূমিগ্রাস করা হয়, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—এসব বিষয়ে এ অধ্যায়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ব্যক্তি, সংগঠন থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত ভূমিগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। অবৈধ প্রক্রিয়ায় তো বটেই, এর সঙ্গে এমনকি বৈধ প্রক্রিয়ায়ও ভূমিগ্রাস সম্ভব। রাষ্ট্র জমি অধিগ্রহণ ও জব্দ করতে পারে। বলপ্রয়োগের পাশাপাশি 'নরম ও কোমল শক্তি' প্রয়োগের মাধ্যমেও এ কাজ করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিগ্রাস কখন ঘটে? শ্রেণিসংঘাত, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, উন্নয়নের ডামাডোল, নাকি বহুজাতিক কোম্পানির নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়ন, কোনটা দায়ী? এসবের চরিত্র কোন তাত্ত্বিক প্রবণতার সঙ্গে মেলে—পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ন, নাকি পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন? এই অধ্যায়ে এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'ভূমি সংস্কার এবং খাসজমির অধিকার : নোয়াখালীর চরাঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ-আন্দোলন'। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের কার্যকারিতা ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিহীন কৃষকের সংগ্রাম

আলোচনা করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার থেকে কারা লাভবান হয়েছে? খাসজমিতে গরিব কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলন কতটা কার্যকর? লেখক জানাচ্ছেন যে ব্রেটন-উডস প্রতিষ্ঠানগুলো (বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইত্যাদি) সমতাকামী পুনর্বণ্টনবাদী ভূমি সংস্কারকে নিরুৎসাহিত করেছে এই অজুহাতে যে গ্রামবাংলায় পর্যাপ্ত জমি নেই। ফলে ভূমি সংস্কারের বদলে ভূমিব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হয়েছে। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, প্রান্তিক কৃষকের পায়ের নিচে জমি আসেনি। কৃষকের নামে জমি বরাদ্দ হয়নি অথবা খানিকটা বরাদ্দ হলেও কৃষক দখলে নিতে পারেননি। এ জন্য বিভিন্ন পরিসরে গণ-আন্দোলন করতে হয়েছে, আবার সবখানে যে তা করা গেছে, এমনটাও নয় কিংবা করলেও তা সব সময় ভালো ফল বয়ে আনতে পারেনি। নোয়াখালীর চরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেস স্টাডি হিসেবে হাজির করে ভূমিগ্রাসের অভিজ্ঞতা ও গণ-আন্দোলনের সাফল্য (অথবা অন্য কিছু) সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। নোয়াখালীর চরাঞ্চলে নব্য উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ধনী ব্যবসায়ী, বনদস্যু, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ও কোম্পানিগুলোর নামে খাসজমি বরাদ্দ দিলে নদীশিকস্তি প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেসরকারি পর্যায়েও জমি দখলের ঘটনা ঘটতে থাকে। নোয়াখালীর কিছু চরাঞ্চলে প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনগুলো ভূমিগ্রাসী শ্রেণি ও সহায়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিকার রক্ষায় কিছু সাফল্যও দেখা গেছে। এসব প্রতিরোধের আক্ষরিক অর্জন কম হলেও পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের বিরুদ্ধে এসবের প্রতীকী তাৎপর্য অনেক।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জাতিগুলোর জুমচাষের জন্য কার্বারিদের (পাড়াপ্রধান) মাধ্যমে পরিবারপিছু ভূমি বরাদ্দ করায় (অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল) ব্যক্তিগত ভূমিমালিকানার দরকার পড়ত না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এ সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ এলাকায় রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল ঘোষণা করে। এর বাইরে সামান্য কিছু জমিতে জাতিগুলোকে বংশপরম্পরায় দলিল ছাড়া থাকতে দেওয়া হয়। দলিলবিহীনভাবে কেবল প্রথাগত মালিকানার দাবি পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশে পাহাড়ি জাতিগুলোকে ভূমি অধিকার নিশ্চিত করেনি। একই সঙ্গে কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনজনিত ভূমিগ্রাস ও জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার জুমচাষিরা আরেক দফা নিপীড়ন ও ভূমি হারানোর শিকার হয়েছেন। সমতল থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় লোক স্থানান্তর ছিল এর কারণ। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তিও পাহাড়িদের দখল হয়ে যাওয়া জমি বেদখল এবং নতুন করে ভূমি

দখল থামাতে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। ইকোট্যুরিজমের নামেও এখন দখল চলছে। লেখক অনুমান করেন, পাহাড়ি জাতিগুলোর কয়েক দশকের গণ-আন্দোলন (সশস্ত্র সংগ্রামও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল) না থাকলে পাহাড়িদের কোনো জমিই দখলের হাত থেকে হয়তো নিস্তার পেত না। নোয়াখালীর চর ও পার্বত্য এলাকায় ধনী, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ও কোম্পানিগুলোর অনুকূলে বিপুল খাসজমি বরাদ্দ থেকে অনুমান করা যায়, কেবল প্রান্তিক ভূমিহীন পাহাড়ি কিংবা নদীশিকস্তি কৃষকের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের যথেষ্ট খাসজমি থাকে না।

'বিল ডাকাতিয়ার মহাসমাবেশ' ষষ্ঠ অধ্যায় নামে জায়গা করে নিয়েছে। আপাতদৃষ্টে বিল ডাকাতিয়ার গল্পে জলাবদ্ধতা প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা গেলেও আলোচনার মূল ক্ষেত্র হলো জমি হারানো। এখানে জলাবদ্ধতা অপরিণামদর্শী উন্নয়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। বন্যা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় মৌসুমি বন্যা দূর করতে গিয়ে স্থায়ী জলাবদ্ধতা ডেকে আনা হয়, যার দায় ঠিকাদারি কোম্পানি, রাষ্ট্রীয় পানি উন্নয়ন সংস্থা, রাজনীতিবিদ ও ডলারমুখী বিদেশি পরামর্শক কেউ নেননি। সমস্যার সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞানের বিপরীতে জনগণের নিজস্ব বিজ্ঞান গড়ে উঠতে দেখা যায়। যারা কেবল প্রতিরোধই করেনি; বরং বিকল্প সমাধানও বের করেছে (সীমিত আকারে হলেও)। প্রতিরোধের একপর্যায়ে বিকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরনির্ভরতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিও ঘটতে পারে বলে লেখক অনুমান করেন।

কী বোঝা যায়?

লেখক গত কয়েক দশকে গ্রামবাংলার পরিবর্তনের আদল ও ধারাবিবরণী দিয়েই কাজ শেষ করেননি; বরং রূপান্তরের চালিকা শক্তিগুলোকেও চিহ্নিত করেছেন। নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এমনই দুই শক্তি। জীবন-জীবিকাও আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক রুচি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। বিদেশি অর্থায়নে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিওগুলোর নানাবিধ কর্মসূচির প্রতিক্রিয়া না বোঝা গেলে গ্রামবাংলার পরিবর্তন অনুধাবন কঠিন হবে। স্থানীয় কৃষি উৎপাদনকে সীমিত আকারে হলেও বিশ্বের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা (অর্থাৎ রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য) গেছে। দেশ-বিদেশে অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে মানুষের অভিবাসন থেকে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে সংসারের খরচ মিটিয়ে খানিকটা বিনিয়োগও করা যাচ্ছে গ্রামে। ফলে গ্রামবাংলার রূপান্তরের কারণ কেবল দেশ নয়, বিদেশও। তাই গ্রামবাংলার নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে নৌকার দুলুনির পেছনে বিশ্বায়নের

ভৌত-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঢেউয়ের ধাক্কাকেও চিহ্নিত করতে হচ্ছে।

পরিবার যে পাল্টে গেছে, তা তো কেবল বিশ্বায়নের ধাক্কা ও পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদনসম্পর্ক পাল্টে যাওয়ার গণিতও। বাংলাদেশ বিমানের একসময়ের স্লোগান, 'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী'র আদলে নগর আর গ্রামের দূরত্ব কমে গেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার, বিনোদন-রুচি ও পেশা গ্রহণে 'আধুনিকতা' অন্যতম প্রাধান্য বিস্তারকারী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। এরপর পাল্টে গেছে সনাতনী সমাজও। সামাজিক বিজ্ঞানে 'টেক্সটবুক সমাজের সংজ্ঞা'র বাইরেও পূর্ব বাংলায় গবেষণা করা পিটার বার্তোচি মুসলিম গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার মিলে একটা অলিখিত জোটের অস্তিত্ব টের পান—একেও স্থানীয়ভাবে সমাজই বলা হয় (পৃ. ২৬)। সালিসের মাধ্যমে সমাজচ্যুতি কিংবা নদীশিকস্তির মানুষ সমাজের অংশ নয়, এমন প্রথার মান্যতা ছিল। আবার *ঝগড়াপুর* গবেষণায় সালিসের বিচার নিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষও দেখা গেছে (পৃ. ২৮)। তবে সালিসভিত্তিক প্রথাগত বৈধ কর্তৃত্বের বদলে পরবর্তী সময়ে 'পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি' জায়গা করে নিয়েছে। এই টানাটানির মধ্যে পড়ে সমাজকাঠামোতে বৈধতার সংকট প্রকট হয়েছে। নেতৃত্বের প্রশ্নে সৎ নেতার চেয়ে করিতকর্মা বা কাজ উদ্ধার করে দিতে পারে, এমন লোকজনকেই পছন্দ করা হচ্ছে। নীতি ও দুর্নীতির এই সহাবস্থান ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে লেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো* কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ৪০)। ব্যাংকঋণকে কেন্দ্র করে একধরনের সরকারি-বেসরকারি নেটওয়ার্কের মধ্যে টাউটরা কীভাবে টাকা বানিয়েছে, তার উল্লেখও খুব প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

গ্রামবাংলার সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মোটাদাগে যে পরিবর্তন, তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষমতার টানাটানি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এই ব্যাখ্যা সব গ্রামের বৈচিত্র্য ও নিজস্বতাকে ধারণ করবে বলে আশা করা যায় না। এসবের বিপরীতে প্রতিরোধ পর্বও আছে, সীমাবদ্ধ সাফল্য নিয়ে। গ্রামবাংলার অধিকাংশ কৃষক নীরব থাকেন, থাকতে বাধ্য হন, এই নীরবতার আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আন্দ্রে বেতেই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবেন। আবার ভূমিগ্রাসের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষক যখন মজুরি শ্রমে অংশ নেন, তখন অপুঁজিবাদী শ্রেণির মানুষের সম্পদ ও শ্রমশক্তির পৃথক্‌করণ ঘটে, যাকে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ন বলা যায়। এভাবে সৃষ্ট সম্পদ ও শ্রমশক্তি পুঁজিবাদী বিকাশে ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়। বর্তমান সময়ের

পরিপ্রেক্ষিতে 'বেদখলের মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয়ন' মডেল এ ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যেখানে লেখক প্রাসঙ্গিকভাবে সহিংস ও অহিংস পন্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র ও বাজার কীভাবে এসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে, তার উদাহরণ সামনে তুলে ধরেছেন (পৃ. ৫৬)। আবার বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় আইরিক ইয়ানসেনের দুর্নীতি পরিচর্যায় দাতাগোষ্ঠী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উৎসাহ দেওয়ার দাবিও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা, চরাঞ্চলসহ সমতলের ভূমিগ্রাস, উন্নয়নকামী বাঁধের ফলাফল হিসেবে জলাবদ্ধতায় জীবিকা হারানো কৃষকদের জন-আন্দোলনের সীমিত সাফল্যের নজির রয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের জমিতে 'সাম্প্রদায়িক পুনর্বণ্টন' ঘটেছে (পৃ. ১১৮)। আবার একই চিত্র সমতলে শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তির নামেও চলেছে। এসব নিয়ে গবেষণা ও বিদ্যায়তনিক চর্চাও খুব বেশি নয়। এসব সামাজিক প্রপঞ্চ বিশ্লেষণে এ এলাকার নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। কাজেই সেই পশ্চিমা তত্ত্বই সম্বল। মার্ক্সের পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ন নামের তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রামবাংলার কৃষিতে পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের প্রবণতা ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হেনরি লেফেব্রের (১৯৭০) ধারণার ওপর ভিত্তি করে ডেভিড হার্ভির দখলদারির মাধ্যমে সঞ্চয়ন ধারণার ব্যবহার করেছেন স্বপন আদনান। প্রাথমিক বর্তনী, মাধ্যমিক বর্তনী ও উচ্চ বর্তনীর আলাপ এখানে আরও প্রাসঙ্গিক হতে পারত। এসব তত্ত্বের ব্যবহার টেক্সটের অর্থ তৈরিতে সাহায্য করছে। তবে আর কোনো তত্ত্বের মাধ্যমে এই কাজ করা যেত, সে আলোচনায় লেখক যাননি। ভূমিগ্রাসের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই কৃষিপ্রশ্ন অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে শুধু দেশের মধ্যে বিচরণ করলে চলছে না (যাকে লেখক মেথোডলজিক্যাল ন্যাশনালিজম বলেছেন), বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরশিতেও দেখতে হচ্ছে। আবার বন্যা মোকাবিলায় বাঁধ নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা আমদানি করার ঘটনাকে 'সরকারি বিজ্ঞান' বনাম 'জনগণের বিজ্ঞান'-এর মধ্যকার ভেদরেখা দিয়ে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অভিনব। এ ক্ষেত্রে 'মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের গণতন্ত্রায়ণ'-এর ধারণা আরও গ্রহণযোগ্য হবে।

যা বলতে চেয়েছেন, তা বলতে পেরেছেন কি?

নগরনিবাসী গবেষকেরা গ্রামবাংলা নিয়ে লিখলে শব্দচয়নে বা বিবরণের মধ্যে

একটা 'বহিরাগত' গন্ধ থাকে। স্বপন আদনানের রচনায় সেই গন্ধ কমানোর চেষ্টা আছে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই প্রবন্ধগুলো কেবল বর্ণনাধর্মী নয়; বরং তত্ত্বঘেঁষা বিশ্লেষণের অভিপ্রায় বইটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তবে লেখক বিদ্যায়তনিক পরিভাষা ও অলংকার প্রয়োগে সতর্ক ছিলেন বলে গবেষক-পাঠককুলের বাইরেও সামাজিক বিষয়বস্তু পাঠে আগ্রহী পাঠকেরাও বিরক্ত হবেন না। এই বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় :

১. লেখক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং গ্রামবাংলার সংকটকে নব্য উদারবাদী বিশ্বায়নের সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন।

২. ১৯৪২-৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশভাগ নামের বেদনার অন্তরালে দুটি বহুল আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ভিত্তি ধরে সব বিশ্লেষণের বিস্তার ঘটেছে।

৩. পুঁজির প্রাথমিক (আদিম শব্দে অনেকের আপত্তি) সঞ্চয়ন ও পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার, ডেভিড হার্ভির বেদখলের ধারণার মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয়ন তত্ত্বের প্রয়োগ দেখানো গেছে।

৪. গবেষণাপদ্ধতি-সংক্রান্ত ও তথ্যের সাধারণীকরণের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে।

৫. বাংলার গ্রামাঞ্চল প্রত্যয়ে সাধারণত হাজির না থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম (পাহাড়), জলাবদ্ধ জমি (বিল) ও জেগে ওঠা জমির (চরাঞ্চল) উপস্থিতি বইটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।

৬. গ্রামবাংলা ব্যাখ্যার সনাতনী মোড়কে ভূমি, ভূমি দখল, ভূমি ব্যবস্থাপনা, সমতাবাদী পুনর্বণ্টনকামী ভূমি সংস্কার, নদীশিকস্তি মানুষ, দখলদার ও আন্দোলনের মতো কম আলোচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৭. সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য সব অধ্যায়ে সমানভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কম আলোচিত হয়েছে।

৮. ভূমিগ্রাসের ধর্মীয় ও জাতিগত পরিপ্রেক্ষিত উঠে এসেছে।

৯. সরকারি বিজ্ঞান বনাম জনগণের বিজ্ঞানের মধ্যকার ভেদরেখা এবং মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের গণতন্ত্রায়ণের ধারণা উপস্থাপন আরও অধিকতর আলোচনার রাস্তা খুলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের সবখানে গ্রামবাংলা কি সামগ্রিকভাবে একই রকম? তা কি

অপরিবর্তনীয় কিংবা একশিলা কোনো সত্তা? সমতলের গ্রাম, পাহাড়ের পাড়া, হাওরের পানিতে মাথা উঁচু করে রাখা গ্রাম, হঠাৎ ডুবে যাওয়া বিল ডাকাতিয়ার গ্রাম, রাজীবপুরের অতি দূরের চরের গ্রাম ইত্যাদির মধ্যকার পার্থক্যগুলো গ্রামবাংলা নামের সর্বব্যাপী প্রত্যয় দিয়ে ঢেকে রাখা যায় কি না? তাতে সম্ভবত বিভিন্ন এলাকার গ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি মনোযোগ ও সুবিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'গ্রামবাংলার রূপান্তর' বলার কারণে কৃষি বা কৃষকসমাজ, গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো, কৃষিকাঠামোর পরিবর্তন, বদলে যাওয়া গ্রাম, কৃষি বিষয়ে ভূমি সমস্যাগুলো ছাপার অক্ষরের নিচে চাপা থাকা টেক্সট হিসেবে রয়ে গেছে। ভূমি এই বইয়ের একটা মূল দৃষ্টিপাত, যা বইয়ের নামে ধরা যায় না।

গ্রামীণ সমাজের সালিসে সনাতনী কর্তৃত্বকে ছাপিয়ে নতুন এলিটদের উত্থান ঘটেছে। নতুন এলিটদের উত্থানে দলীয় রাজনীতির সর্বগ্রাসী ভূমিকা থাকলেও সনাতনী কর্তৃত্বের ক্ষমতা হ্রাসের পেছনে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ১৯৯০-পরবর্তী মিডিয়ার ভূমিকাও আছে। তারা গ্রামবাংলার সনাতনী সিভিল সমাজের জায়গায় নতুন ধরনের সিভিল সমাজের উত্থানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। এ কথা ঢাকাসহ অন্যান্য নগরের ক্ষেত্রেও খাটে। ভূমিগ্রাসের প্রবণতার বর্গীকরণ ও তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টাকে অনবদ্য বলেই মনে হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের পেছনে কেবল সরকারি বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রশ্নাতীত নয়, জনগণের বিজ্ঞানেরও ভূমিকা নিশ্চিত করা দরকার। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিদ্যায়তনিক 'মহাজন জ্ঞান' বনাম 'স্থানীয় জ্ঞানের কারবার'-এর ফলাফল যাচাই এবং 'কনসালট্যান্সি সায়েন্স' বনাম 'লোকায়ত জ্ঞান'-এর দ্বৈরথ এই রূপান্তরের যাত্রাপথে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মুঠোফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মুঠোফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামকে গভীরভাবে পাল্টে দিচ্ছে। অনলাইনে 'ডিজিটাল কৃষক', 'ভার্চুয়াল চাষি' ও 'ই-ফার্মিং'-এর ধারণা পোক্ত হচ্ছে। গ্রামবাংলার সমাজ কেবল মানুষের নেটওয়ার্কের বদলে মানুষ ও না-মানুষদের (তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তি) সমন্বয়ে 'সমাজ-প্রাযুক্তিক' নেটওয়ার্ক হয়ে উঠছে। ব্রুনো লাতুর পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় ট্রান্সলেশন বা অনুবাদের কথা বলছেন। এসব অতি সাম্প্রতিক পরিবর্তন এই বইয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসেনি। তবে কতিপয় সীমাবদ্ধতাসহ বইটি গ্রামবাংলার রূপান্তরের আদল ও ধারা অনায়াসে আমাদের সামনে হাজির করতে পারছে।

● **ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

বই আলোচনা

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সব উত্তর মিলল না

কাজী জাওয়াদ

India and the Bangladesh Liberation War—Chandrashekhar Dasgupta, Jaggernaut Books, New Delhi 2021

'সংঘটিত কোনো ঘটনায় আসলে কী ঘটেছিল, তা বের করাই ইতিহাসবিদের সম্পাদ্য। এবং "ঘটনাটা ছিল এই রকম" ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি তা নিষ্পন্ন করেন।'[১] টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক উইলিয়াম ড্রে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কথাটি লিখেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে খুব কম বই-ই ড্রের সংজ্ঞা অনুসারে 'ঘটনাটা আসলে কী ঘটেছিল' সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশদ গবেষণা করে লেখা হয়েছে। যে শত শত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই স্মৃতিকথা ও সাক্ষাৎকারমূলক। আর সাক্ষাৎকারভিত্তিক বইও আসলে এক অর্থে স্মৃতিকথাই, অপরের স্মৃতির ভিত্তিতে লেখা। তবে বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে একটি চন্দ্রশেখর দাসগুপ্তের *ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* (*India and the Bangladesh Liberation War*)।

বইটির মলাটের ভাঁজে তাই বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ৫০ বছর পরও কতগুলো প্রশ্ন রয়ে গেছে। যেমন ভারতের কি পাকিস্তান ভেঙে ফেলার কোনো পরিকল্পনা ছিল? কখন এবং কেন ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল? ভারত কখন সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? অন্য কোনো দেশ কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম সমর্থন করতে চায়নি? নির্লিপ্ত সোভিয়েত

ইউনিয়নকে ভারত কেমন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর্থন করাতে রাজি করলো? সিমলা চুক্তিতে কি ভারতের হার হয়েছিল ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রথম প্রশ্নটিই বাংলাদেশি পাঠকদের টানে, টানবে। দাবি করা হয়েছে, এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য শ্রী দাসগুপ্ত সুদীর্ঘ ১৮ বছর ধরে গবেষণা করেছেন এবং অনেক কাল্পনিক কাহিনি অপ্রমাণ করেছেন।

উপসংহারে দাসগুপ্ত লিখেছেন, ভূরাজনীতিতে মিসেস গান্ধী এবং তাঁর প্রধান সহকারী পি এন হাকসারের তাত্ত্বিক যোগ্যতা নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মতো ছিল না। তারপরও তাঁরা দূরদৃষ্টির বলে সাফল্য পেয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের ফলাফলে ভারতের নীতিনির্ধারকেরা যুগপৎ আশাবাদী ও শঙ্কিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গণতন্ত্রে উত্তরণ নস্যাৎ করতে চাইলে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলাযুদ্ধ চীন বা ভারতের মাওবাদী অথবা নকশালপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে।

ইয়াহিয়া বাঙালিদের আকাঙ্ক্ষা ত্রাসের মাধ্যমে দমন করতে চেয়ে পাকিস্তান ভাঙনের শেষ আঘাতটি করেন। এর ফলে বিপুলসংখ্যক বাঙালি শরণার্থী ভারতে চলে যায় এবং ভারতের জন্য নিরাপত্তাঝুঁকির সৃষ্টি করে। তাই ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ঠিক তখনই ঢাকা দখলের চিন্তা তারা বাদ দেয়। কারণ, সেনাবাহিনীর তেমন কোনো আপৎকালীন পরিকল্পনা ছিল না। ভারত বছর ঘোরার আগেই স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা করে, যাতে চীন বা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি হয়ে না যায়। আটঘাট বেঁধে যুদ্ধ করার কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা ভারতের আগে থেকে ছিল না। তবে সাময়িক ব্যবস্থা নিয়ে তেমন একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

যুদ্ধকৌশলের মূল পরিকল্পনায়ও ঢাকা দখলের সিদ্ধান্ত ছিল না। লে. জেনারেল জ্যাকবের পরিকল্পনায় যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকা দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বইগুলোয় ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দাসগুপ্ত যুদ্ধের সমাপ্তিকে সিমলা চুক্তি পর্যন্ত টেনে নিয়েছেন। বিশ্লেষণ করেছেন, চতুর পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁদে পড়ে মিসেস গান্ধী যুদ্ধে বিজয়ী হলেও কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিলেন কি না।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

বইটি পড়তে গিয়ে ২৬ নম্বর পৃষ্ঠাতেই যে হোঁচট খেতে হয়, তা ১৮ বছর ধরে

গবেষণার দাবি প্রশ্নবিদ্ধ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আইনকাঠামো আদেশ* সম্পর্কে দাসগুপ্ত লিখেছেন, 'এভাবে নির্বাচিত পরিষদ ষাট দিনের মধ্যে একটি নতুন সংবিধান রচনা করবে—...' (The assembly thus elected was to draw up a new constitution within sixty Days—...)। অথচ লেখক ভারত সরকার প্রকাশিত দুই খণ্ডের *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস* (*Bangladesh Documents*) নামের যে আকরগ্রন্থটি ব্যবহার করেছেন, তার প্রথম খণ্ডে আইনকাঠামো আদেশের (LFO) পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। সেটার ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২৪ নম্বর ধারা দেখা দরকার ছিল। সেখানে বলা আছে, নির্বাচিত পরিষদ ৬০ দিনে নয়, ১২০ দিনের মধ্যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।

মলাটের ভাঁজের লেখা অনুযায়ী (অনুমান করি) ভারতের পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা ছিল কি না, সে প্রসঙ্গই লেখকের গবেষণার প্রধান বিষয়। বাংলাদেশি পাঠকও বিষয়টি জানতে আগ্রহী। অথচ ৫৩ নম্বর পৃষ্ঠায় মাত্র দুটি বাক্যেই এমন কোনো পরিকল্পনা থাকার কথা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের শুরুতে শ্রী দাসগুপ্ত লিখেছেন, 'কোনো কোনো বইয়ে ভারতকে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে পাওয়া সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর কথা বলা হয়। দালিলিকভাবে এই ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তার পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, 'ভারতের নীতিনির্ধারকেরা পাকিস্তান ভাঙনের পরিণতি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।' কিন্তু কোন কোন বইয়ে এমন দাবি করা হয় এবং কেন সেগুলো ভুল, তার পক্ষে কোনো দলিলের বরাত দেওয়া হয়নি। ৩২ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই লিখেছেন, 'স্মরণ করা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকেই [অশোক] রায়ের সঙ্গে মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।' কেন এই যোগাযোগ? তার ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

নেহরু যে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বেতার ভাষণে 'অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঐক্যবদ্ধ ভারত' পাওয়ার ইচ্ছার কথা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে 'কাঙ্ক্ষিত ভারতের ছবি হৃদয়ে ধরে রাখার' কথা, আচার্য কৃপালনির 'ঐক্যবদ্ধ ভারতের

*অবিভক্ত পাকিস্তানে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) নামে একটি আইনের আওতায় পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ী সদস্যদের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদ হিসেবে কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং একে মাত্র ১২০ দিনের সময়সীমার মধ্যে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এলএফওতে জাতীয় পরিষদের ক্ষমতাকে নানাভাবে সংকুচিত করা হয়। ভবিষ্যৎ সংবিধানের কিছু মূলনীতি আগেই ঠিক করে দেওয়া হয় এবং বলা হয়, জাতীয় পরিষদ নতুন সংবিধানে এসব নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য থাকবে।—**সম্পাদক**

দাবি'র কথা, সরদার প্যাটেলের ভাষায় 'আমরা আবার এক হব', ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীর ঘোষণা যে '...ভারত সরকারকে এর [পাকিস্তানের] বিরুদ্ধে যুদ্ধ' করার কথা বলেছিলেন; সেগুলোর কোনো রেশ ভারতের সরকারি কার্যক্রমে রয়ে যায়নি, এটাও প্রমাণ করা দরকার ছিল। অধুনা যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোর উল্লেখ নাই-বা করলাম।

আবার দাসগুপ্ত যে সভায় নীতিনির্ধারকদের সন্দেহের কথা লিখেছেন, ২৮-৩২ পৃষ্ঠায় 'ভারতের প্রতিক্রিয়া-জানুয়ারি ১৯৭১' অধ্যায়ে তার বিবরণ রয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং 'র'-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ সুস্পষ্ট ছিল। তিনি লিখেছেন, 'কেবল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাকিস্তান বিভাগের প্রধান অশোক রায় কাওয়ের ('র' প্রধান) সঙ্গে একমত ছিলেন।' ৬ জানুয়ারি ১৯৭১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় দুই বিভাগের মধ্যে ভিন্নমতই প্রমাণ করে, ওই সভার আলোচনা কোনো 'দালিলিক' প্রমাণ নয়। আসলে গবেষণাভিত্তিক ইতিহাসে কোনো ধারণা বা প্রস্তাবনার পক্ষে যতটুকু যুক্তি আশা করা যায়, শ্রী দাসগুপ্ত তার কিছুই দেননি।

বইটিতে দেওয়া সব তথ্য নির্ভুল নয় বলেই মনে হয়। অন্তত লেখক অন্য কোনো বইয়ের প্রতিষ্ঠিত তথ্য খণ্ডন করার দায়িত্ব পালন করেননি। যেমন এপ্রিল মাসে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গ। দাসগুপ্ত লিখেছেন, '...১১ই এপ্রিল তাজউদ্দীন বিএসএফের দেওয়া একটি ছোট বেতার সম্প্রচারযন্ত্র দিয়ে আগরতলা থেকে এক উদ্দীপক বক্তৃতা দেন।' (...Tajuddin made a rousing broadcast from Agartala on 11 April on a small radio transmitter supplied by the BSF.) *মূলধারা '৭১* বইয়ে মঈদুল হাসান প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের প্রবাসকালীন প্রয়োজনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত বিএসএফ কর্মকর্তা শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন, '১১ই এপ্রিল বাংলাদেশের নিজস্ব বেতারকেন্দ্রের অভাবে শিলিগুড়ির এক অনিয়মিত বেতারকেন্দ্র থেকে তা প্রচার করা হয়। পরে তা আকাশবাণীর নিয়মিত কেন্দ্রসমূহ থেকে পুনঃপ্রচারিত হয়।' জানা যায়, শিলিগুড়ি ও আগরতলার আকাশপথের দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। এখানে গবেষক দাসগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত তথ্যের পাল্টা একটি নতুন তথ্য উত্থাপন করেছেন। আগের তথ্যটি ভুল প্রমাণ করার দায়িত্বও তাঁর। তা করেননি।

বইয়ের ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'হাকসার সংকটের শুরুর সময়ে আগে থেকেই সঠিক জানতেন যে, আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিতে অভ্যন্তরীণ

বিষয়ে ভূখণ্ডের অখণ্ডতা এবং হস্তক্ষেপ না করার নীতি গভীরভাবে প্রোথিত।' অংশটুকু বাংলাদেশ রাষ্ট্র বা প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। কারণ, এ যুক্তিতেই প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করা হয়েছিল। কিন্তু হাকসার যা জানতেন বা যা বলতেন, তা কি ঠিক?

মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রথম প্রকাশিত বই *বাংলাদেশ : আ স্ট্রাগল ফর নেশনহুড*। বাংলাদেশের সংগ্রামের পটভূমি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন অধ্যাপকের লেখা প্রবন্ধ রয়েছে বইটিতে। ১৯৭১ সালেই দিল্লি থেকে বইটি প্রকাশ করে বিকাশ পাবলিকেশন্স। এতে 'লিগ্যাল অ্যাসপেক্টস' নামের প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রহমতউল্লাহ্ খান আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, '...ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে সম্ভাব্য স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইনে কোনো বাধা নেই।'

সংকটের গোড়ার দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে। শ্রীনাথ রাঘবন *1971 A Global History of the Creation of Bangladesh. (2013, Harvad University Press)* [(১৯৭১ *: বাংলাদেশ সৃষ্টির বৈশ্বিক ইতিহাস*) নামে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিতব্য] বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন। তিনি লেখেন, 'প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ (জেপি) নারায়ণ স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুললে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।' বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ভারতের সাবেক মন্ত্রী এম সি চাগলা জেপিকে বলেছিলেন, 'স্বীকৃতির জন্য সাধারণত যা প্রয়োজন—ভূখণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সেখানে কার্যকর প্রশাসনের শর্ত—তা বাংলাদেশের বেলায় খাটে না। বাঙ্গালিরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তাদের সংখ্যালঘুদের থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী করা যায় না।'

ডেভিড হ্যারিসের *কেসেস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস অন ইন্টারন্যাশনাল ল* (টমসন রয়টার্স, লন্ডন, ২০১০ সংস্করণ) বইয়ের ৭৪৫ পৃষ্ঠায় 'দ্য ইউনিল্যাটারাল ইউজ অব ফোর্স বাই স্টেটস' প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করে তিনটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে—১. ভারত কি বাংলাদেশি গেরিলাদের সাহায্য দিতে পারত? ২. এর সঙ্গে শরণার্থী সমস্যা কি সম্পর্কিত ছিল? এবং ৩. ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ভারত আক্রমণ করার অধিকার পাকিস্তানের ছিল কি না? এ নিয়ে আত্মরক্ষা বিষয়ে কয়েকটি আকরগ্রন্থ পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাতে

অনুমান করা যায় যে আত্মরক্ষার যুক্তিতেও ভারত বাংলাদেশ রাষ্ট্র বা সরকারের স্বীকৃতি দিতে পারত। যদিও ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, ভারতের পাকিস্তান আক্রমণ আত্মরক্ষার মতবাদের অধীনে ন্যায়সংগত বলে দাবি গ্রহণযোগ্য নয়; তবে পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘনের মাধ্যমে ভারতের ওপর ক্রমাগত ও অসহনীয় উদ্বাস্তুর বোঝা সৃষ্টি করায় মানবিক হস্তক্ষেপের দাবি করা যেত।

দাসগুপ্ত নিজেই ২১৮ পৃষ্ঠায় নিরাপত্তা পরিষদের সভায় শরণ সিংয়ের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে মি. সিং বলেন, 'কোনো দেশ যদি এত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আনুগত্য হারায়...এবং তা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক আইনে সেই রাষ্ট্র [বিচ্ছিন্ন অংশ] প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' এগুলো সবই পি এন হাকসারের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেয়। দাসগুপ্ত এগুলো উল্লেখ না করেই হাকসারের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেছেন। যে কারণে তাঁর গবেষণাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যায়।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বইগুলোয় লেখকেরা পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনকেই যুদ্ধের শেষ দিন বলে দেখিয়েছেন। দাসগুপ্ত যুদ্ধের পর সন্ধির বিষয়কেও যুক্ত করেছেন। সিমলা সমঝোতা (agreement) স্বাক্ষরের প্রতিদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য সব বিষয়ই অন্যান্য বইয়ে পাওয়া যায়।

বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনুসন্ধানে 'কী ঘটেছিল' মানে শুধু ভারত কী করেছিল, তা নয়। ভারত কোনো ভুল করে থাকলে বা তার কোনো ব্যর্থতা থাকলে, সেটাও আলোচ্য বিষয়। তা বের করা ইতিহাস লেখকের দায়। ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এই বিবেচনায় দাসগুপ্তের গবেষণা পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রচ্ছদে বইটিকে 'চূড়ান্ত কাহিনি' বলে দাবি করা হলেও প্রচ্ছদ দিয়ে বইটিকে বিচার করা যায় না।

● **কাজী জাওয়াদ** সাংবাদিক।

১. Dray, W. (1959). *"Explaining What" in History*, in P. Gardiner (Ed.), Theories of History, New York, The Free Press, P. 403.

দলিলপত্র

নিক্সন বললেন, ‘মুজিবকে গুলি কোরো না’

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র বহুমুখী সংকটে পড়ে। একদিকে তারা সমস্যাটার রাজনৈতিক সমাধান চায়, যেহেতু যুদ্ধ কোনোভাবেই তখন মার্কিন স্বার্থের পক্ষে যেত না বলে তারা ভেবেছিল। অন্যদিকে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মানবিক বিপর্যয় চলতে থাকলে, ভারতে কোটিরও বেশি শরণার্থী অবস্থান করলে ভারতের দিক থেকে মানবিক হস্তক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তান আক্রমণ করার যুক্তি থাকে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জারসহ শীর্ষ কয়েকজন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে একদিকে পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকানো, আবার একই সঙ্গে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী বাঙালিদের জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাঁচানোর মতো জটিল এক কৌশল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা চালানোর জন্য বেসামরিক প্রশাসন বহাল করার কৌশলে রাজনৈতিক সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টিই ছিল ওই সময়ে মার্কিন নেতৃত্বের লক্ষ্য। ওই জটিল সময়ের ঐতিহাসিক সংলাপই তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এই গোপন দলিল। এ দলিলের উৎস যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভস, নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস। দলিলটি পাওয়া গেছে **মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান**-এর মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ১৯৬৯-১৯৭৬, ভলিউম ১১, দক্ষিণ এশিয়া সংকট, ১৯৭১

সংরক্ষণের জন্য স্মারক নং ১২১ ওয়াশিংটন, আগস্ট ১১, ১৯৭১, ৩ : ১৫-৩ : ৪৭ পিএম

অংশগ্রহণকারী

প্রেসিডেন্ট

হেনরি এ কিসিঞ্জার, প্রেসিডেন্টের সহকারী

জন আরউইন, পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি

থমাস মুরার, চেয়ারম্যান, জেসিএস

রবার্ট কুশম্যান, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের সহকারী পরিচালক
মরিস উইলিয়ামস, ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এআইডি
জোসেফ সিসকো, পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি
আর্মিস্টিড সেলডেন, প্রতিরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, আইএসএ
হ্যারল্ড এইচ স্যান্ডার্স, এনএসসি কর্মকর্তা

পাকিস্তান বিষয়ে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ মিটিংয়ের শুরুতে ড. কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট এসআরজির মুখ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর নিজ দপ্তরে পাকিস্তান নিয়ে কথা বলতে চান।

সভার সবাই সিচুয়েশন রুম থেকে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে চলে এলে প্রেসিডেন্ট এই বলে শুরু করেন যে দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে স্যান ক্লেমেন্টে তাঁর সঙ্গে অ্যাডমিরাল মুরার ও মি. হেমসের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল এবং অবশ্যই সেক্রেটারি রজার্সের সঙ্গে তাঁর টানা যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু এই গ্রুপের অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তাঁর হয়নি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখানো উচিত, সে বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এভাবে দেখানোটা 'অপরিহার্য'। এরপর তিনি নিম্নলিখিত লাইনে কথা বলেন :

প্রথমত, অন্য সবকিছুর ওপরে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের নিরিখে এ পরিস্থিতিকে দেখতে হবে। পরিস্থিতি খোলাখুলি সংঘাতের দিকে চলে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ 'ব্যাপকভাবেই ভন্ডুল' হবে। "যুদ্ধ এড়াতে আমাদের যেকোনো কিছু—যেকোনো কিছু করতে হবে"। যারা যুদ্ধে জড়াতে চায়, তাদের 'নিরস্ত' করতে আমরা 'সবকিছু— যা যা পারি'—করব।

জনসংযোগ বিষয়ে গণমাধ্যমের আর এখন ভিয়েতনাম নিয়ে বেশি কিছু লেখার নেই। পাকিস্তানই এখন বড় সংবাদ। রাজনৈতিক সমাজ—ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান—এ বিষয়ে 'ব্যাপক শোরগোল' তুলেছে। 'এবং মানুষের দুর্ভোগের দিক থেকে দেখলে তাঁদের এটাই করা উচিত'।

দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৬৯ সালের নাইজেরিয়ার অনেক পার্থক্য থাকলেও বায়াফ্রা প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সমস্যাটির রাজনৈতিক মাত্রার বাইরেই অবস্থান করেছিল। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভোগ এবং ভারতে থাকা শরণার্থীদের বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ওই ফ্রন্টে আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই বাড়াতে হবে।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক কিছু করেছি, কিন্তু আমাদের বাজেটের বিবেচনায় সম্ভাব্য 'সবচেয়ে বৃহৎ' উদ্যোগ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য সহায়তার বিষয়েও আমাদের উৎসাহিত করতে হবে।

(প্রেসিডেন্টের) কথার মধ্যে ড. কিসিঞ্জার বলে উঠলেন যে মানবিক সমস্যার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম, পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের সমস্যা। এ সমস্যা কাটাতে আমাদের প্রকল্পগুলো নিয়ে মাউরি উইলিয়ামস কাজ করছেন। দ্বিতীয় হলো শরণার্থী সমস্যা, ভারতীয় শরণার্থীশিবিরগুলোয় তা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান।

প্রেসিডেন্ট বলে চললেন :
আমরা কি দ্বিপক্ষীয় না বহুপক্ষীয় কাঠামোর মাধ্যমে সাহায্য করব, আমাদের অবশ্যই যা যা করতে পারা সম্ভব, সব করতে হবে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা 'মাসখানেক বা তার আগে' এসেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ফরাসি ও ব্রিটিশদের জোরালো বিবৃতি নিয়ে 'আমাকে টিটকারি' করলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেন তারা কী বলেছে, তা নিয়ে কথা না বলে তারা কী করেছে, সেদিকে তাকাতে। ভারতে থাকা শরণার্থীদের ত্রাণের ব্যাপারে আমেরিকা যা করেছে, বাদবাকি সবাই মিলে তা-ও করেনি।

ইউরোপীয় অন্য দেশগুলোকেও এ ব্যাপারে অবদান রাখার জন্য চাপ দিতে হবে। আমরা 'খুব বেশি কিছু পেতে যাচ্ছি না', কিন্তু আমাদের উচিত 'এটাকে ইস্যু করে তোলা'। তাদের কিছু মাত্রায় বিব্রত করে ফেললে আমরা যা প্রকৃতপক্ষে করেছি, সেটাকে নাটকীয় করে তোলা আমাদের জন্য সহজ হবে।

সমস্যাটি আমেরিকায় ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে কি না, তা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সন্দেহ রয়েছে। চিলির বিপর্যয় যতটা সাড়া ফেলেছিল, এটা ততটা সাড়া জাগাবে না। তারপরও আমাদের 'সর্বাত্মকভাবে—সর্বাত্মকভাবে—ত্রাণ তৎপরতা চালাতে হবে'।

সমস্যাটির রাজনৈতিক দিকে আলোকপাত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি ততটা জোরালোভাবে তাঁর অবস্থান তুলে ধরতে পারেননি। কিছু ভারতীয় ভাবছেন, ভারতের স্বার্থ যুদ্ধের মাধ্যমেই পূরণ হবে। কিছু পাকিস্তানিও যুদ্ধে জড়াতে ইচ্ছুক। 'ইউএসএসআর [সোভিয়েত ইউনিয়ন]—কী চাইছে, তা আমি জানি না'। যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণ হবে না। চীনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক সম্ভবত মেরামতের অযোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ইউএসএসআরের দিক থেকে আমরা পাব 'খুবই কষ্টদায়ক সমস্যা'।

'খুবই কাঠখোট্টাভাবে বললে' তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ভারতে যাচ্ছেন। যে [মার্কিন] রাষ্ট্রদূতই ভারতে যান না কেন, দেশটার প্রেমে পড়ে যান। পাকিস্তান নিয়েও কারও কারও একই অভিজ্ঞতা রয়েছে—যদিও তত বেশি নয়, কারণ পাকিস্তানিরা ভিন্ন ধাতের। পাকিস্তানিরা সোজাসাপটা—এবং কখনো কখনো চরম আহাম্মক। ভারতীয়রা তাদের চেয়ে বেশি প্যাঁচালো, কখনো কখনো এতই চালাক যে আমরা তাদের ফাঁদে পড়ে যাই।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কী করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর 'কাছে কোনো ব্রিফ নেই'। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে 'মোটেই' শরণার্থী সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তান ভাঙতে দিতে 'পারে না'। প্রেসিডেন্ট যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলেন, তাঁর কাছে 'প্রতীয়মান' হয়েছে যে ভারত কী করতে চায়। তা হলো, নয়াদিল্লির অবস্থানে থাকলে তিনি যা করতে চাইতেন, ভারত তা-ই করছে।

এখন, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের জায়গা থেকে, যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য অভিমুখে তার প্রভাব খাটানো দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে 'এই চুক্তিটুকু' করেছে। [৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি প্রসঙ্গে]। কেউ কেউ মনে করেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য রাশিয়া পাকিস্তানকে শাস্তি দিতে চায়। এই দৃষ্টির আলোকে, রুশিরা যেভাবে ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধের আগে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকাত, সেভাবেই তারা পরিস্থিতিটা দেখছে। বিপদ হলো, সেখানে তারা এমন শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, যা কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

সমস্যা হলো, ভারতীয়রা যদি 'পূর্ব পাকিস্তানে যা খুশি করে' অথবা সেখানে গেরিলাযোদ্ধা পাঠায়, তাহলে আত্মঘাতী হলেও পাকিস্তানিরা যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে মি. সিসকো ও মি. আরউইনের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের এখন 'আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের যারা ভারতপন্থী, তাদের নিরস্ত করতে হবে'। আমরা ভারতকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু তাদের যে লক্ষ্য [পাকিস্তান ভাঙা] তার অংশীদার আমরা হতে পারি না। 'যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, আমি জাতীয় টেলিভিশনে যাব এবং কংগ্রেসকে বলব ভারতের জন্য সব সাহায্য বন্ধ করে দিতে। তারা একটা পয়সাও পাবে না।'

পাকিস্তানে আমাদের কিছু সুবিধাজনক মাধ্যম (লিভারেজ) থাকা দরকার। অবশ্যই রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের কাছে আমাদের উদ্বেগগুলো জানাতে হবে। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যদি পাকিস্তানের জন্য সব

সহায়তা বন্ধ করি, তাহলে মানবিক বিপর্যয় বিষয়ে আমাদের যা কিছু প্রভাব, তা হারিয়ে ফেলব। সম্ভবত আমরা সবচেয়ে যা খারাপটা আশা করছি, তা কোনোভাবে ঘটে যাবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চিতভাবে—সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে—যুদ্ধ ঘটা বন্ধে তার প্রভাব ব্যবহার করতে হবে।

মোটাদাগে, জনপরিসরে আমাদের অবস্থান হলো, (১) আমরা শরণার্থী ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করায় নেমে পড়ব; (২) কোনো যুদ্ধ হতে দেওয়া যাবে না, কারণ তাতে কারও উপকার হবে না; (৩) প্রকাশ্যে আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও পাকিয়ে উঠতে দেব না। রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আমরা কাজ করব অপ্রকাশ্যে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা আমাদের কাজ নয়। পাকিস্তানকেই তার ভবিষ্যতের পথ বের করতে হবে। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে কী করছে, তা দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পরিমাপ করব না। একই বিচারে কমিউনিস্ট দেশগুলোয় যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার কারণে পৃথিবীর সব কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করব।

কারও কোনো প্রশ্ন আছে কি না, তা জানতে চেয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মি. সিসকো বলেন, প্রেসিডেন্ট যে রূপরেখা তুলে ধরলেন, আমরা সেই ত্রিমুখী অবস্থান অনুসরণ করে আসছি। একটা বিষয়ে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ জানাতে চান। তিনি আশা করেন, যেখানে সার্বিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এগিয়ে নেওয়ার ধাপগুলো বিষয়ে আমাদের বাস্তব পরামর্শ জানানো দরকার, সেখানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে ফারল্যান্ডের যাওয়া বারণ করবেন কি না প্রেসিডেন্ট (নিক্সন)। আমাদের সার্বিক লক্ষ্য যা আছে—ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্ভবত শান্তি অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, সে বিষয়ে তিনি অবগত—তাতে তিনি আশা করেন যে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের কাঠামোর আওতায়, যেখানে আমাদের বাস্তব পরামর্শ আছে, যা ইয়াহিয়াকে রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে আরেকটু সরাতে পারে, ফারল্যান্ড যেন সেসব পরামর্শ তাঁকে জানান।

মি. সিসকো সোভিয়েত-ভারত চুক্তির গুরুতর প্রতিক্রিয়া আশা করেন। ভারতীয়রা হয়তো সীমান্তের ওপারে প্রচলিত সামরিক পদক্ষেপ নিতে বাধা অনুভব করতে পারে, কিন্তু গেরিলাদের পাঠাতে তারা উৎসাহিত হতে পারে।

'শুধু ত্রাণে কাজ হবে না'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়তো বেশি দূর যেতে পারবেন না। তবে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে যদি কোনো অগ্রগতি না থাকে, গেরিলাযুদ্ধ চলতে থাকবে এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রতিহিংসাও চলতে থাকবে এবং শরণার্থীরা হয়তো তখন আর দেশে ফিরতে চাইবে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইয়াহিয়া হয়তো মনে করবেন, ভারতে অবস্থিত গেরিলা শিবিরে হামলা করা প্রয়োজন।

মি. সিসকো বলে চললেন, ভারতীয়রা এমন কিছু করেনি, যা খুব খারাপ। তাদের দিক থেকে তারা জাতিসংঘকে শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করা ঠেকিয়েছে। তিনি একমত যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের আসল নীতি। তা কীভাবে হবে, তাতে আমাদের যায়-আসে না। আমাদের স্বার্থ হলো, যদি তা ঘটে, তা যেন শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে।

একটা জিজ্ঞাসা দিয়ে মি. সিসকো বক্তব্য শেষ করেন, যখন আমাদের পরামর্শ তৈরি হয়ে যাবে—রাজনৈতিক সমাধানে আমাদের কোনো নীলনকশা যে নেই, সেদিকে ইঙ্গিত করে—তখন বন্ধুত্বসুলভ কায়দায় তা জানানো ঠিক হবে কি না? এমন পরামর্শগুলোর একটি হতে পারে মুজিবুর রহমানকে [আওয়ামী লীগ নেতা দেশদ্রোহের অভিযোগে এখন পাকিস্তানে বিচারাধীন] হত্যা না করা।

উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, ঘটনা হলো আমরা এখনো সাহায্য বন্ধ করিনি এবং ইয়াহিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও খুব ভালো, 'সম্পূর্ণভাবে ফাঁদে না পড়ে থাকলে' ইয়াহিয়ার পক্ষে আমাদের কথা শোনা সম্ভব। রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া তাঁর বন্ধু বলে ভাবেন। আমাদের যদি কোনো পরামর্শ থেকে থাকে—যেমন 'মুজিবকে গুলি না করা'—ফারল্যান্ড সেটা তাঁকে জানাতে পারেন। ফারল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলে প্রেসিডেন্টের মনে হয়েছে, তাঁর অভিপ্রায় হলো রাজনৈতিক সমঝোতা বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে 'আরও নমনীয় অথবা আরও নিপুণ' হওয়ার বিষয়ে রাজি করানো।

কথার মধ্যে কথা বলে উঠলেন ড. কিসিঞ্জার, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কী করতে বলা উচিত, তার হেরফের নিয়ে এই বৈঠকে প্রেসিডেন্টকে সালিস করতে বলা উচিত নয়। কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব এখানে মূল সমস্যা নয়। ভারত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনকে রাজনৈতিক সমঝোতার সঙ্গে জড়িত করে কি না, সেটাই মূল বিষয়। আমরা যদি নেমে পড়ি এবং ভারতীয়দের খেলা খেলি, তাহলে আমরা পাকিস্তানের ভাঙনে অংশগ্রহণ করলাম। যখন গেরিলাদের প্রত্যাহার করার জন্য ভারতীয়দের সত্যিকারভাবেই অসিলার দরকার হবে এবং

কিছু আপসমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তেমন ভারতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন; আমাদের দিক থেকে ইয়াহিয়ার কাছে প্রসঙ্গটি তোলা তখনই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু তাঁকে কলকাতার আওয়ামী লীগারদের সঙ্গে সমঝোতা করতে বলা মানে 'আব্রাহাম লিংকনকে জেফারসন ডেভিসের সঙ্গে চুক্তি করতে বলা'।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি ইয়াহিয়াকে তেমনটা করতে বলতে পারেন না। আমরা ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নির্ধারণ করতে দিতে পারি না। এর সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, পশ্চিম পাকিস্তানও সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের যদি সুস্পষ্ট পরামর্শ থাকে, তবেই রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড অনানুষ্ঠানিকভাবে ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন।

ড. কিসিঞ্জার বলেন, যদি পয়েন্টটি শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রস্তাবের সঙ্গে 'গাঁথা' থাকে, তাহলে হয়তো ইয়াহিয়া শুনবেন বলে তিনি চিন্তা করছেন। এটা এমন ধরনের বিষয়, যা মাউরি উইলিয়ামস ভালো বলতে পারবেন, যদি তিনি পাকিস্তানে যান। যদি উইলিয়ামস শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে প্রস্তাবটি জুড়ে দিতে পারেন, তাহলে ইয়াহিয়া তাঁর কথা শুনতেও পারেন। পাকিস্তানের জনগণের অখণ্ডতা বজায় রাখার শর্তের সঙ্গে জড়িয়ে প্রস্তাবটি তোলা যেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট সম্মতি জানালেন, একমত হলেন যে মি. উইলিয়ামস ইয়াহিয়াকে 'মানবিক সহায়তার নামে রাজনৈতিক কিছু করার' সুযোগ দিতে পারেন।

ড. কিসিঞ্জার আরও বিশদ করতে গিয়ে মনে করিয়ে দেন যে মি. উইলিয়ামস আগে এই যুক্তি দিয়েছিলেন, পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কখনো বড় আকারের বেসামরিক কার্যকারিতা ছিল না। এখন যখন খাদ্য বিতরণে যথেষ্ট রকম বেসামরিক উদ্যোগ প্রয়োজন, তা থেকে যে কেউ বলতে পারে, খাদ্য বিতরণের জন্য বেসামরিক প্রশাসন বহাল করা অত্যাবশ্যক। খাদ্য বিতরণের বিবেচনা থেকে কথা বলাতে গিয়ে জোর পড়তে পারে বেসামরিক প্রশাসন বহাল করার ওপর, যদিও একই সঙ্গে জানা থাকবে যে বেসামরিক প্রশাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

মি. উইলিয়ামস একমত হলেন যে শুরু করার জন্য এটা চমৎকার চেষ্টা হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট আগের বিষয়ে ফিরে বললেন যে মুদ্রার অপর পিঠ হলো মি. আরউইন ও মি. সিসকোর উচিত তাঁদের 'লোকেদের বলা যে প্রকাশ্যে

রাজনৈতিক ইস্যুতে অবস্থান নেওয়া তাঁদের কোনো কাজে আসবে না। রাজনৈতিক সমঝোতা বিষয়ে আমাদের লোকেদের প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ থাকতে হবে'। ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইয়াহিয়াকে বলতে পারি, মুজিবকে তাঁর গুলি করা উচিত হবে না।

মি. আরউইন এই যুক্তি দিয়ে মি. সিসকোর উপস্থাপনার সারবস্তু তুলে ধরেন, আমরা যে মাত্রা পর্যন্ত ইয়াহিয়াকে রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে ঠেলতে পারব, সফল একটি ত্রাণ কর্মসূচির দিকে সে মাত্রা পর্যন্ত যাওয়াও সহজ হবে। তিনি এ-ও জানান, এটা করার সময় আমরা পর্দার আড়ালে কাজ করতে পারি।

ড. কিসিঞ্জারের কাছে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'ইয়াহিয়াকে দেওয়ার' মতো কোনো ধারণা তিনি খুঁজে পেয়েছেন কি না।

ড. কিসিঞ্জার উত্তরে বলেন, আমরা যদি আমাদের পরামর্শগুলোকে ত্রাণ কর্মসূচিবিষয়ক পরামর্শের আকার দিতে পারি, তাহলে ইয়াহিয়া তা শুনতে পারেন। প্রশ্ন হলো, আমরা কি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরির জন্য ত্রাণকে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ হিসেবে ব্যবহার করব, নাকি ভারতীয়রা যাতে আক্রমণের কোনো অজুহাত না পায়, সে জন্য ত্রাণকে ব্যবহার করব?

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'জায়গাটা সেখানে কে চালাচ্ছে', তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

ড. কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া 'দুনিয়ার সেরা লোক নন' কিন্তু তাঁকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়া করতে বলা কঠিন কাজ হয়ে যাবে।

মি. আরউইন বলেন, ওই সকালে তাঁরা সেক্রেটারি রজার্সের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের কাছে প্রতিবেদন এসেছে যে কলকাতার কিছু আওয়ামী লীগ নেতা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি ত্যাগ করার ভিত্তিতে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দর-কষাকষি করতে চান। যে প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে, তা হলো রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড কি ইয়াহিয়াকে এ পরামর্শ দেবেন যে যদি আওয়ামী লীগ সত্যিই তাদের স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাহার করে, তাহলে ইয়াহিয়া যেন তাদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি বিবেচনায় নেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হলেন সেখানে আমাদের মূল ব্যক্তি। তাঁর পরামর্শ হলো, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়াকে কোনো কিছু বলার নির্দেশ না দেওয়া হোক। তিনি পরামর্শ দিলেন, ফারল্যান্ডের চিন্তাভাবনা জানার জন্য তাঁর সঙ্গে যেকোনো ধারণা নিয়ে কথা

বলা হোক। আমাদের এখনই তাঁকে কোনো চূড়ান্ত কথা বলার দরকার নেই, কারণ এখানে আমরা হয়তো ভালো কিছু ধারণায় উপনীত হব, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনোভাব জেনে রাখা উচিত।

মি. সিসকো বললেন, সবার চলে যাওয়ার মুখে তিনি আলোচনার বিষয় বদলাতে চান যে সোমবার জাতিসংঘে তিনি এবং সেক্রেটারি রজার্স যা পেয়েছেন, তার ভিত্তিতে পুনরায় আশ্বস্ত হয়েছেন। কেউ না ভাবলেও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংগঠন।

মি. উইলিয়ামস বললেন, আমরা সবকিছু নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাব। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের মতে, ভারতে থাকা শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান এখন পর্যন্ত মোট ১৭০ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান ৭০ মিলিয়ন ডলার। বাড়তি সহায়তা প্যাকেজের জন্য এআইডির সুপারিশ প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বললেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে এটা গ্রহণ করবেন।

● ইংরেজি থেকে অনূদিত।

প্রাপ্তি সূত্র : ন্যাশনাল আর্কাইভস, নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস, এনএসসি ফাইলস, এনএসসি ইনস্টিটিউশনাল ফাইলস (এইচ-ফাইলস), বক্স এইচ-০৫৮, এসআরজি মিটিং, পাকিস্তান/সাইপ্রাস, ৮/১১/৭১। গোপন; এনওডিআইএস। স্যান্ডার্স কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওল্ড এক্সিকিউটিভ অফিস ভবনে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় বা যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ১০০ (একশত) ডলার; দুই বছরের বেলায় যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা অথবা ১৮০ (একশত আশি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

সরাসরি পাওয়া যাবে প্রথমা প্রকাশনের সব বিক্রয়কেন্দ্রসহ প্রচলিত বইয়ের দোকানে। এ ছাড়া অনলাইনে কেনা যাবে www.Prothoma.com থেকে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

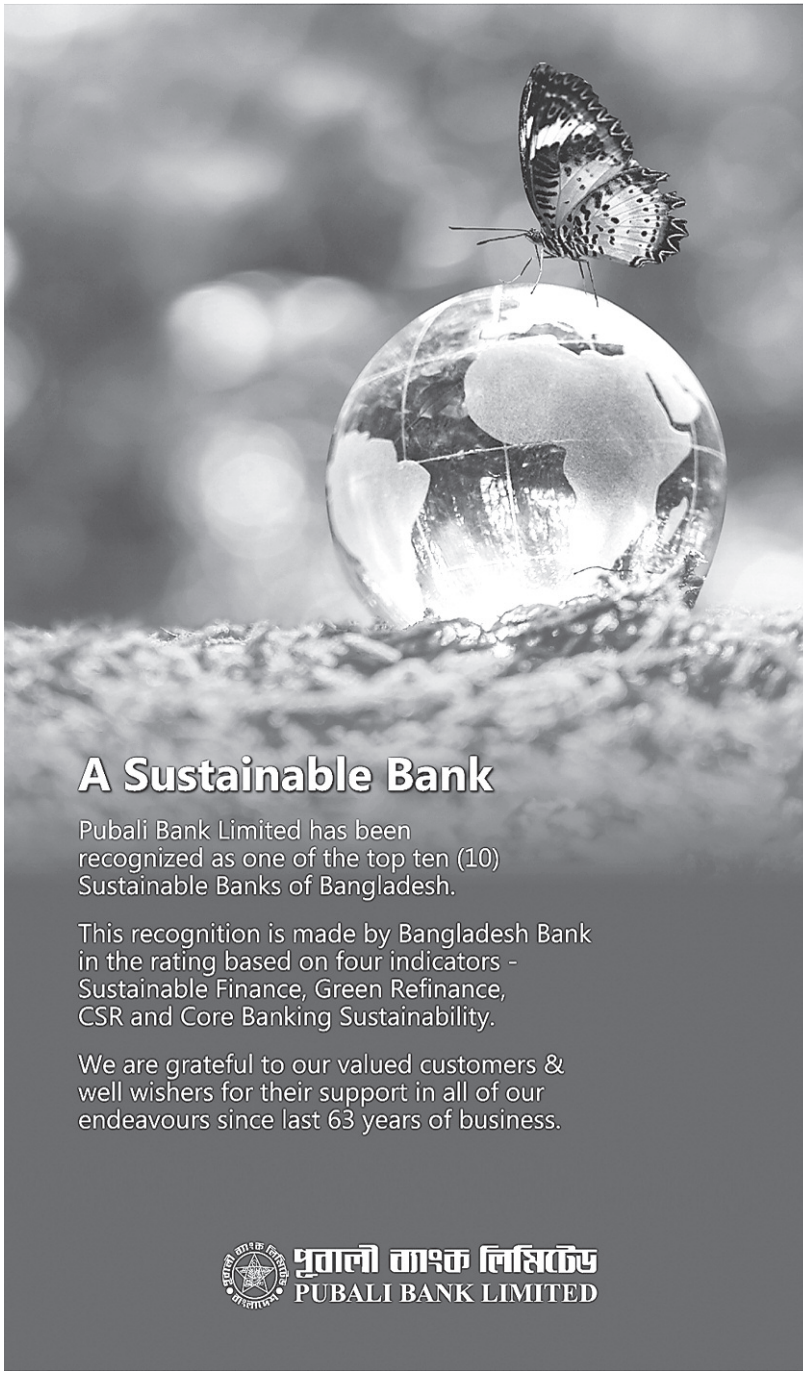

A Sustainable Bank
Pubali Bank Limited has been recognized as one of the top ten (10) Sustainable Banks of Bangladesh.
This recognition is made by Bangladesh Bank in the rating based on four indicators - Sustainable Finance, Green Refinance, CSR and Core Banking Sustainability.
We are grateful to our valued customers & well wishers for their support in all of our endeavours since last 63 years of business.
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

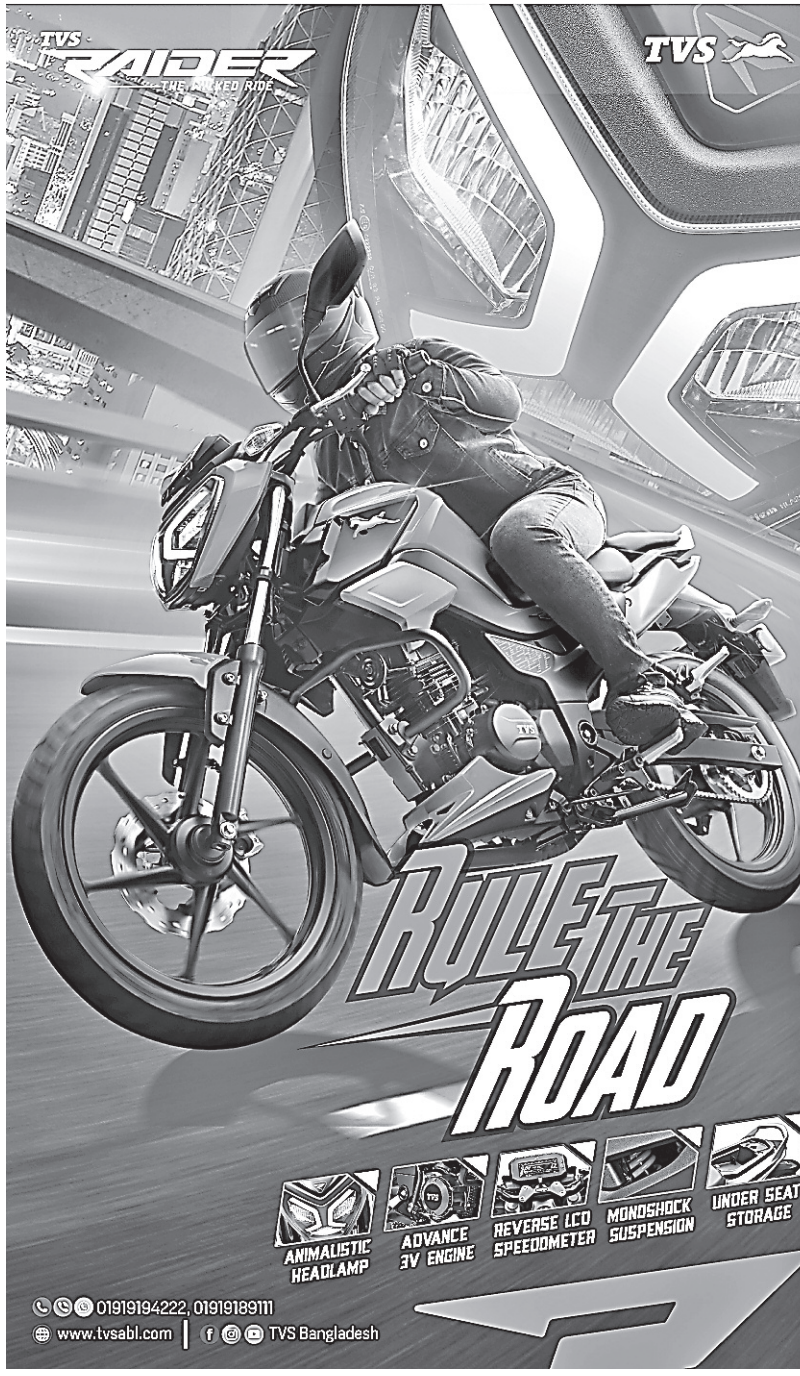
TVS
RAIDER
THE NAKED RIDE
TVS
RULE THE ROAD
ANIMALISTIC HEADLAMP
ADVANCE 3V ENGINE
REVERSE LCD SPEEDOMETER
MONOSHOCK SUSPENSION
UNDER SEAT STORAGE
01919194222, 01919189111
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh

EXPERIENCE
LUXURY WITH BANK ASIA
CREDIT CARD

VALUE ADDED SERVICES

- Easy Buy Facility @ 0% interest
- Hospital Bill EMI Facility @ 5% Interest (Flat)
- Buy One Get One Free* (BOGO) Facility
- Any POS Purchase EMI Facility @ 9% interest (Flat)
- Complementary Airport Protocol Service Facility*
- Free Balaka Lounge Access Facility*
- Reward Point Redeem Benefits
- Triple Benefit Credit Shield Facility
- Discount Facilities on Renowned Merchant Outlets

WE OFFER

- Minimum Fees & Charges
- No CIB Charge
- Free SMS Service
- Free Supplementary Card

*T&C Apply

cards.bankasia-bd.com
24/7 service 16205

Bank Asia

সেলফিন
আগামীর ব্যাংকিং

চলতে ফিরতে জার্নিতে ব্যাংকিং করি মনের খুশিতে

- ইন্সট্যান্ট ভার্চুয়াল প্রিপেইড কার্ড (ভিসা/মাস্টারকার্ড)
- নিজে নিজে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা
- সরাসরি বৈদেশিক রেমিট্যান্স গ্রহণ
- ইউটিলিটি (ডেসকো, ডিপিডিসি, তিতাস ও ওয়াসা) বিল প্রদান
- ই-টিকেটিং (বাস, এয়ার ও লঞ্চ)
- রিকোয়েস্ট মানি, এটিএম ক্যাশ আউট
- ই-কমার্স/মার্চেন্ট পেমেন্ট
- স্কুল/কলেজ ফিস পেমেন্ট
- খিদমাহ্ (ক্রেডিট) কার্ডের বিল প্রদান
- যেকোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট/কার্ডে ফান্ড ট্রান্সফার
- যেকোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/কার্ড, এমক্যাশ ও সিআরএম এর মাধ্যমে ইন্সট্যান্ট ক্যাশ ইন

এক অ্যাপেই
সকল ব্যাংকিং সমাধান

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com

contact center 16259 or 02-8331090

www.fsiblbd.com
সবার জন্যে সবসময়
ক্যাম্পেইন অফার
নতুন হিসাব কিংবা FSIBL CLOUD
অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন অফার গ্রহণেই নিশ্চিত
আকর্ষণীয় উপহার ।
NESCO
রবি
DESCO
নগদ
টেলিটক
ওয়াসা
FSIB ISLAMI BANK
CLOUD
Download FSIBL Cloud app
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক হয়ে
উপভোগ করুন অভিনব ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা
Call Center 16257 24/7
CERTIFIED ISO 27001:2013 COMPANY
FSIB ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

YANMAR

ACI Motors

ধান ও গম কাটার স্মার্ট সমাধান
ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার

ঘণ্টায় ১.২৫ একর জমির ধান ও গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী করতে সক্ষম

দেশের একমাত্র
স্টিয়ারিং হুইল টাইপ
হারভেস্টার

800++
সার্ভিস টিম দিয়ে
সারা দেশব্যাপী
বিক্রয়োত্তর
সেবা দেয়া হয়

ইয়ানমার হারভেস্টার ক্রয়ের
ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে
১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
সরকারি ভর্তুকি (হাওর এলাকায়
২১ লক্ষ ৭০ হাজার)

এ সি আই মটরস্ যে সব সুবিধা দিচ্ছে
- ফ্রি ড্রাইভার ট্রেনিং
- ১ বছরের ওয়ারেন্ট
- ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা
- দেশব্যাপী খুচরা যন্ত্রাংশের নিশ্চয়তা

স্মার্ট অ্যাসিস্ট রিমোট (এসএআর)
সম্বলিত যার মাধ্যমে ঘরে বসে
মোবাইলেই মেশিনের প্রয়োজনীয়
তথ্য পাওয়া যায়।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
/yanmarbd

Customer Care 16533

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই
আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'
মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'
এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*
এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য
এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'
মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'
মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'
মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সুরা নিসা, আয়াত ২৫
আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'
মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'
এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'
এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে
EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246
www.eximbankbd.com

মুজিববর্ষের স্পর্শে

স্পন্দিত রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ

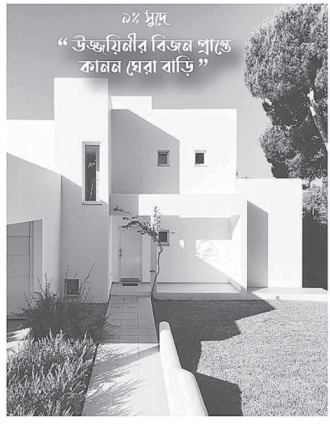

রবি ঠাকুরের

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন - ঘেরা বাড়ি।

আপনার এই চিরন্তন স্বপ্নপূরণে রূপালী ব্যাংক
সবসময় পাশে আছে

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন ঃ- সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ, ৩৪ দিলকুশা, বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা - ১০০০. ফোন- ৯৫৫১৯৯০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে নিবেদিত একটি লাল সবুজ ব্যাংক

www.rupalibank.org

16434
al-arafahbank.com
LA RIBA
ISLAMIC
CREDIT CARD
লা রিবা
মাস্টার কার্ড
সুবিধা বেশি, ঝামেলা কম
বাংলাদেশে এই প্রথম সুদমুক্ত ডুয়েল কারেন্সি
সমৃদ্ধ লা রিবা মাস্টার কার্ড
মুদারাবা
সঞ্চয়ী হিসাব
যিনি সঞ্চয়ী, তিনি জয়ী
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক-এর মুদারাবা
সঞ্চয়ী হিসাব আপনার বর্তমান ও আগামীকে
করবে মুনাফা সমৃদ্ধ ও নিরাপদ
মাসিক কিস্তি
ভিত্তিক মেয়াদী জমা
প্রতি মাসের জমায়, এককালীন বিশাল আয়
সহজ কিস্তিতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা
বিনিয়োগ করুন, মেয়াদান্তে অনন্য মুনাফা
উপভোগ করুন
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
aibl
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
Al-Arafah Islami Bank Limited
সর্বদাই শরীয়াহ্
www.al-arafahbank.com

সারা বছর সেরা বই

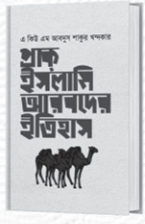

প্রবন্ধ, গবেষণা ও অন্যান্য

সম্পাদক : মতিউর রহমান

- **প্রিয় আনিসুজ্জামান** তাঁকে লেখা চিঠিপত্র ৳ ৬২০

মহিউদ্দিন আহমদ

- **একাত্তর ও পঁচাত্তর** ইতিহাসের বাঁকবদল ২য় মুদ্রণ ৳ ৩০০
- **পার্বত্য চট্টগ্রাম** শান্তিবাহিনী জিয়া হত্যা মনজুর খুন ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৮০০

বদরুল আলম খান

- **কেন পুনরায় মার্ক্স** ৳ ৫৫০

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

- **তবকাত-ই-নাসিরী** ৳ ১২০০

এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

- **প্রাক্-ইসলামি আরবদের ইতিহাস** ৳ ৪০০

ধর্ম

সম্পাদক : ইমতিয়াজ আহমেদ

- **প্রাণপ্রাচুর্যে ইসলাম** ৳ ৫০০

ইংরেজি

Rounaq Jahan & Rehman Sobhan

- **Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman** Philosophy, Politics and Policies ৳ ৩৫০

Edited by Matiur Rahman

- **1971** The Siliguri Conference ৳ ৩৫০

প্রথমা প্রকাশন

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭
৪৩-৪৪ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬০০
মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬৪৮

ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯